“রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্র”

মূল ধারার রাজনীতি

<u>সার সংক্ষেপ</u>

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতির জন্য নতুন সংবিধান।

যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের সূচনালগ্ন হতে রাজনীতির পথচলা। ইহার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। কিন্তু গণতান্ত্রিক পথে রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন অনুপস্থিত, আর অনুপস্থিত বা মোটেও নেই মতবাদের মাপকাঠিতে রাজনৈতিক অধিকরের বিচার বিশ্লেষণ । বিশেষ করে বর্তমান সময় গণতান্ত্রিক অধিকারে রাজনীতির মূল্যায়ন শূন্যের কোঠায়, নেই রাজনীতিবিদদের মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা , কারণ রাজনীতির আদর্শগত নীতির পরিবর্তে অপ-রাজনীতির সংস্কার দেশকে গ্রাস করছে। বর্তমানে রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়, শুধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি এবং পেশিশক্তির আবির্ভাবের জন্য রাজনীতি। মূলকথা রাজনীতিতে পথচলার নীতিগত বিষয় দেশের বর্তমান সংবিধানে অনুপস্থিত, নেই কোন পথচলার দিক-নির্দেশনা।

১৮.৪৫ কোটি মানুষের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট দেশটি। যাহার লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আগামী ২০৫০ সালে জনসংখ্য দাড়াবে দ্বিগুণের মত, প্রায় ৩৬.২০ কোটি ,জনসংখ্যার ঊর্দ্ধগতি নানা সমস্যায় জর্জরিত জনজীবন। যাহার ফলে বৈপ্লবিক ক্রান্তিকাল অতিক্রম। কারণ রাজনীতির অবমূল্যায়ন এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং দলাদলীর রাজনীতি, বিশেষ করে রাজনীতিতে জনগণের আস্থার অভাব পরিলক্ষিত ।

সকল বিষয় সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারে রাজনীতির সক্ষমতা অর্জনে নতুন ধারার রাজনৈতিক সংবিধান আবস্যক, অর্থাৎ যে সংবিধনে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তি স্বার্থরক্ষায় সচেতন, সে রাজনৈতিক সংবিধান জনগনের মঙ্গল বয়ে আনবে, কিন্তু জনগনকে সচেতন হওয়ার সক্ষমতা রাজনীতিতে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতি সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মূল হাতিয়ার। রাজনৈতিতে আদর্শগত সচেতন অনুশীলণ এবং প্রথা বা পদ্ধতি যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। বাংলাদেশের বেলায় ব্যতিক্রম নহে। যাহার যুক্তি হলো ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের বহি:প্রকাশে সহিষ্ণুতা ও আপোষ এবং সমঝোতা ইত্যাদি রাজনৈতিক চর্চা ও অনুশীলণ আশা-আকাঙ্খার প্রদীপ, যাহা সর্বক্ষেত্রে আলো ছাড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশের কাতারে বাংলাদেশের জন্য রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা বা রাজনীতির নতুণ সংবিধান প্রবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব বিষয় হলো ৭৭% ভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস, তাহাদের কাছে রাজনীতির নীতিকথা এক প্রকার তামাশা মাত্র, আর তারা জানে ঘরে ভাত- মাঠে ফসল - মনে শান্তি এক নীতি, পরে রাজনীতি ।

রাজনীতি পরিভাষায় রাজনীতিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা দেশ এবং জনগনের মঙ্গল, সামাজিকভাবে রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা দূর করা, বিশেষ করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের চাবিকাঠি বলা চলে। যেমন-সেবা দান ও সেবা গ্রহণ (Service take and give).

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আমাদের আকাঙ্খিত স্বাধীন, সার্বভৌমত্ব দেশের জন্ম প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলার জন্য রচিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান। রচিত সংবিধানের আলোকে গৃহীত মূলনীতির অন্যতম একটি নীতি গণতন্ত্র। যাহার

প্রতিফলন দেশ ও সমাজের মাঝে অংশীদারিত্ব ফিরিয়ে পাওয়া। কিন্তু অংশীদারিত্ব রাজনীতি সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মূল সেতু বন্দন ব্যবস্থা। যে রাজনীতিতে ভাতের ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে আসবে তাহার নাম গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি বলা চলে, বিশেষ করে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারনে সামাজিক গণতন্ত্র বলা চলবে।

কিন্তু গণতন্ত্রের মতাদর্শ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপে পরিচালিত। যাহার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিভিন্ন মতাদর্শের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বিদ্যমান। কিন্তু ঐ সকল সংজ্ঞার আলোকে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দরতম সংজ্ঞার আলোকপাত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তাহার মতে-

জনগণের সরকার, জনগণের জন্য সরকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার । (Government of the People, for the People, by the People).

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে উক্ত সংজ্ঞার আলোকে বেশীর ভাগ গণতান্ত্রিক দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশও ইহার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিকাশিত গণতন্ত্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। না হওয়ার মূল করণ হলো রাজনৈতিক দলের মধ্যে সচেতনতার পরিবর্তে উদাসিনতা ভাব বিদ্যমান। আরো কারন হলো উপদলীয় কোন্দল পারস্পারিক সহনশীলতার অভাব বিদ্যমান। দলীয় প্রতিহিংসার রাজনীতি বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফলে সমঅধিকার অনুপস্থিত।

গণতন্ত্রে রাজনীতির সকল শক্তির উৎস তৃণমূল জনগণ।

জনগণের কথা, জনগণের স্বার্থ, জনগণের ব্যক্তি স্বার্থ সহ মত প্রকাশের রাজনীতি ও জনগণের ইচ্ছার বহি:প্রকাশ এবং জনশক্তির মর্যাদা মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে অধিকার সংরক্ষণ যে গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা পায় ইহার নাম সামাজিক গণতন্ত্র। আর তাই সামাজিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসাবে আমার মত প্রদর্শন, যেমন-জনগণের স্বার্থকতার সংরক্ষণ ও মূল্যায়নে তৃণমূল জনগণের মনের বহি:প্রকাশের আলোকে মহামান্য যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দেওয়া সংজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে আমার মত প্রদর্শন,

জনগণের জন্য সরকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগনের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি নয়।

(Government for the People, elected by the People, Fundamental rights establish for the people. But no loss for state).

উক্ত সংজ্ঞার আলোকে রাজনীতি পরিচালিত হলে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত পাবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। দলীয় ও নি:র্দলীয় সমাজ ব্যবস্থার সমন্বয়ে শাসন ক্ষমতার সম অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, জনকল্যাণে মঙ্গল বয়ে আনবে, জনজীবনে শান্তি ফিরে আসবে। বিশেষ করে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রবর্তনে ১৮.৪৫ কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

মৌলিক অধিকারের মধ্যে জনগনের ধর্মীয় আচার আচরন মূর্খ ভূমিকা রাখার দাবিদার। অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যবস্থা সামাজিক ভাবে গণতন্ত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় মূল সেতু বন্ধন। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বসবাস ৫৬ হাজার বর্গমাইল ভূখন্ডে। যার যার ধর্মীয় আচার আচরন তাহার ব্যক্তিগত, উৎসব তাহার নিজের, সামাজিক বন্দন ও রাজনীতিতে সম-অধিকার। সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচরনে মত পার্থক্য অবস্য থাকবে এবং আছে, এখানে দিমতের কোন কারন নেই। ধর্ম পালন যার যার নিজস্য ব্যক্তিগত অধিকার, সামাজিক ভাবে একে অপরের

সাহায্যে এগিয়ে আসা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, কিন্তু এখানে ধর্মের ব্যবহার সম্পুর্ন নিষিদ্ধ। একটি কথা বলতে হয় সকল ধর্মের যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ হওয়া মিল পরিলক্ষিত সে সকল বিষয় এক মত পোষন, যেমন জীব বা মানুষ হত্যা সৃষ্টিকর্তার নিষেধ, কিন্তু ইসলাম ধর্মে মহাপাপ, মিথ্যা কথা না বলা, কাহার অধিকার হরন না করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, বয়জেষ্ঠকে বয়জেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শন করা, কাহার ধর্মকে কঠাক্ষ না করা এবং শৈশবে ধর্ম শিক্ষা লাভ ইত্যাদি আদর্শ নীতি যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সমাজে বৈষম্যহীন রাজনীতি প্রসার লাভ করবে। ধর্মীয় নিয়ম নীতি সভ্যতার মূল মন্ত্র, অহিংস রাজনীতি গণতন্ত্রের পথে আলোর দিশারী।

সামাজিক গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ যৌথদল প্রতিষ্ঠা ও যৌথদলের জন্য দলীয় সদস্য আহরণ এবং আহরণকৃত সদস্য হতে দলীয় নেতা-নেত্রী প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত করা। প্রতিটি স্তরে দুটি প্রাক-নির্বাচন এবং মূল নিবাচন দ্বারা দলীয় নেতা-নেত্রীর যোগ্যতা যাচাই করে নিবাচিত করা।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো দলীয় সংগঠন প্রথা প্রবর্তন করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশীদারিত্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। দলীয় সংগঠন প্রথা বা পদ্ধতি জনগণের স্বার্থরক্ষা রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার। রাজনীতির মূল উৎস জনগণ, আর জনগণের দল। দলীয় রাজনীতি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলণ। জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন নেতৃত্ব বিকাশ। আর রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ার। দেশের ও জনগণের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার দাবীদার ।

বর্তমানে দেশে ছোট বড় প্রায় ১শ টি দল বিদ্যমান। এদের নেতা-নেত্রীর সংখ্যা শত শত, কিন্তু অনেক দলের মধ্যে নেতা-নেত্রীর মূল্যায়ন নেই বললেই চলে, এমনকি অনেক দলের অস্তিত্ব রক্ষায় তাহারা সচেতন নয়।

কিন্তু প্রতিটি দল দলীয় নিজস্ব অস্থিত্ব রক্ষায় এক একটি দূর্গ। তাহাদের সংখ্যা হাতে গোনা। এমনকি কোন কোন দলের নেতা-নেত্রী আছে, কিন্তু জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা নেই । আবার কোন কোন দলে জনসমর্থন আছে, কিন্তু যোগ্য নেতা-নেত্রী অভাব পরিলক্ষিত, ফলে দলগুলো নানা কারনে দ্বিধাবিভক্ত। উক্ত কারনে দলীয় নেতা-নেত্রী মর্যাদা রক্ষার যৌথ দলের সন্নিবেশিত করা দলীয় অধিকার। ফলে ১শ টি দলের মধ্যে তাদের নিজস্ব দলীর অস্তিত্ব রক্ষার পর যৌথদলে সম্পৃক্ততা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে দলীয়ভাবে অংশীদারিত্ব বজায় রাখার মূলক্ষেত্র।

<u>রাজনীতি পশ্চাৎমূখী পথ হতে উত্তরণ:</u>

বর্তমান রাজনীতিতে দলগত বৈষম্য বিদ্যমান। শুধু প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রদর্শিত হচ্ছে। পরনির্ভরশীলতা সকল ছোট ছোট দলগুলির মধ্যে বিদ্যমান, রাজনীতির সকল স্তরে বিভাজনের রাজনীতি দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা কলুসিত, বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত রূপ সকল দলের মধ্যে,কল্যাণমুখী রাজনীতি দ্বিধাভক্ত এবং জনজীবনে ভয়াবহ হতাশা। অর্থনৈতিক দুর্দশার যে অবস্থা তা দেশকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে অর্থাৎ তলানিতে নিয়ে যাবে। যার ফলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্বের সংখ্যা, দুর্নীতি বাজদের অবাধ বিচরণ, জনজীবনের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ অসামাজিক কার্যকলাপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে আস্থা ও বিশ্বাস সমূলে অধ:পতনের দিকে ধাবিত, বাস্তবতা হলো বাংলার দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে অনুকূল পরিবেশ নেই বললেই চলে। সামাজিক ব্যবস্থায় অবক্ষয়ের ফলে আজ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মুখ থুবড়ে পড়ছে। কারণ অবৈধ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে আজ রাজনীতি অন্ধকারে আছন্ন।

উন্নয়ন হলেও দেশ আজ গণতান্ত্রিক চর্চার অভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনতার পর প্রায় ৫ দশকের বেশী সময় অতিবাহিত, দেশ আজ অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন চোখে পড়ার মত। কিন্তু স্বার্থানেশী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কারনে সমালোচিত। তারপরও উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ নহে, ফলে তাহারা প্রসংশার দাবিদার। কিন্তু আগামী দিনের সরকার দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করার পথে মনযোগী হবেন। কিন্তু দলের

রাজনীতি পরনির্ভরশীল অবস্থা হতে এখনো সরে আসতে পারেনি। পারেনি একে অপরের প্রতি আস্থা রাখতে, যদি অবস্থার পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়, জনগণের আস্তা অর্জনে কোন প্রকার বাধা থাকতো না।

বিগত সরকারের মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়িত, কিন্তু দুর্নীতির বেড়াজালে দেশ আজ দেওলিয়ার পথে। তবুও পারস্পরিক জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজকে উন্নত করার আদর্শনীতি আলোর দেখা পথ এখনো ক্ষীণ অবস্থায় আছে। যাহার সমাধানের জন্য মানুষের সমর্থন প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক দলীয় ইচ্ছার বহি:প্রকাশ ঘটার প্রয়োজন আছে বলে বিজ্ঞজনেরা মনের করেন।

রাজনীতির গণতান্ত্রিক অধিকারে মূলনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিক নতুন সংবিধান প্রয়োজন। যাহার বাস্তবায়নে মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিফলণের জন্য আদর্শনীতি যথাযথ প্রয়োজন। এই সংবিধান দেশের সংবিধান নয়, কিন্তু দেশের সংবিধানের আলোকে রাজনৈতিক অধিকারের সংবিধান। ইহা রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষেত্রে নূতন পদক্ষেপ মাত্র। মূলত বর্তমান ১৮.৪৫ কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক রাজনীতির সংবিধান।

রাজনীতির বর্তমান বিপর্যয় পরিস্থিতি সমাধানে নতুন সমীকরন:

গত জুলা**ই** -২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-আন্দলনে বাংলাদেশের পঠ পরিবর্তন ও স্বৈরশাসনের অবসান এবং গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশ।

বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনায়, যার কর্নধার মহামান্য প্রধান উপদেষ্টা **ড. মুহাম্মদ ইউনুস,** বর্তমানে তিনি **১৮.৪৫** কোটি গনমানুষের নয়নের মনি, তাহার আদর্শনীতি, উদারততা ও স্বক্ষমতা এবং বাস্তবমূখী পদক্ষেপে জনগণ মুগ্ধ।

কিন্তু তথাকথিত স্বার্থন্বেষী মহল বা ব্যক্তি দেশের শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার পায়তারায় ব্যতি ব্যস্ত। কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে তথাকথিত মহান রাজনীতিবিদ বলে মনে করেন। তাহাদের চিন্তাধারা শুধু ক্ষমতার চেয়ার, ক্ষমতার জন্য নির্বাচন। পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিগত সময় তাহারা তাদের কার্যকলাপে প্রশ্নবিদ্ধ , তাহারা সমাজপতির চেয়ে বিত্তশালী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাদের আধিপত্য বিস্তার পরিচিতি জনগনের মুখে মুখে। বিশেষ করে **১৯৯০** সালের পর হতে আধিপত্তের প্রভাব লাগাম ঠেনে ধরার মত নেত্রিত্ব আসে নাই বা জন্ম নেয়নি। তাহারা মনে করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান, তাই তাদের নির্বাচন নিয়া তথাকথিত মাথাব্যথা ও হুঙ্কার। বর্তমান সময় স্বার্থনেষী মহল সরকারের ভাল কাজ চক্ষে দেখতে পায় না বলে প্রতিনিয়ত অপবাদ ছড়াচ্ছে, কিন্তু যার ভিত্তি নাই। বিষেশ করে তাদের তথাকথিত কর্মকান্ডে জনগণ হতাশা গ্রস্ত।

বিশেষ করে নিরীহ জনগণ সকল অধিকার হতে বঞ্চিত, কারন রাজনীতির সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, দূরবিত্তায়ন, ক্ষমতার প্রভাব এবং অপনীতি ইত্যাদি অশুভ শক্তি রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রসারিত বা বিদ্যমান। একশ্রেণীর স্বার্থন্বেষী মহল তার বিত্তায়নের প্রসার লাভ এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য, ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচন ত্বরান্বিত করার পায়তারায় ব্যস্ত। হয়তো বা দেখা যাবে একসময় ছাত্র সমাজ ও জনগণের দ্বারা তাহারাও পাকড়াও হওয়ার সম্ভাবনায়, কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি জেন না হয়। তাদের রাজপ্রাসাদ ধূলায় মিশে যাবে, কারন জনগণ জানে তাদের বৃত্তয়ানের রাজনীতির আড়ালে অসাংবিধানিক পথ তাদের মূলধন।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক আদর্শনীতি। বর্তমান সময়ের রাজনীতি বহুদলীয় বেড়াজালে সীমাবদ্ধ। তাদের নীতি নৈতিকতা একই বৃত্তে বাঁধা। তোষামদী রাজনীতি কখনো জনগণের দায়িত্ব নিতে পারে না, শুধু টাকা বানানোর মেশিন সৃষ্টি তাদের কাম্য। যদি জনগণের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং সকল

রাজনৈতিক দল ঐক্যমত পোষণ করে, ফলে দেশের সকল অবাঞ্চিত আগাছা উপড়ে দেওয়ার শক্তি বর্তমান সরকারের আছে।

সংস্কার শুধু একটি কথিত নাম, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন নৈর্তৃত্ব প্রয়োজন। সকল নিরীহ মানুষের সকল অধিকার ফিরিয়ে আনা মহান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে অধিকার হরণ হয়ে গেছে, তাহা রাজনৈতিক দলের পক্ষে ফিরিয়ে দেয়া বর্তমান সময়ের জন্য অনেক দূঃসাধ্য। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় শৃঙ্খলা ও আচরনবিধি সম্বন্ধে উদাসিন। দলগুলির নেতানেত্রীর দ্বন্ধ চরমে, ফলে রাজনীতি কয়েকজন বৃত্তশালী দূর্নীতিবাজদের হাতে বন্দি। প্রত্যেক দল তাদের পছন্দের লোকজনকে নেতানেত্রীর আসনে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা আজও বিদ্যমান। দলের মধ্যে কোন প্রকার জবাবদিহীতার লেশমাত্র নেই, নেতানেত্রী নির্বাচনের প্রতিযোগীতা অনুপস্থিত।

সমাজের সর্বস্তরে একই অবস্থা, পছন্দের মানুষ টাকার জোরে নেতৃত্বের আসন পায়। রাজনীতির মধ্যে জনগনের ইচ্ছা বা মতের বহিঃপ্রকাশ অনুপস্থিত। দলীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য দলীয় নির্বাচন অর্থাৎ প্রতিযোগীতামূলক নির্বাচনের কোন বিকল্প পথ খোলা নেই।

রাজনীতির কারণে দেশের জন্য আমরা আমাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ প্রতিফলিত করি, নিজ নিজ দলের প্রতিযোগীতামূলক নির্বাচন দ্বারা সমাজের সর্বস্তরে নেতানেত্রী নির্বাচিত করি, দলীয় নির্বাচন প্রতিযোগীতা মূলক পরিবেশ সৃষ্টি করি, দলগুলিকে বৃহত্তর দল হিসেবে আত্নপ্রকাশের মাধ্যমে সম-মানের দল সৃষ্টি করি এবং বৈষম্যহীন দলের আত্নপ্রকাশ গণতান্ত্রিক অধিকার।

বর্তমানে ১৩.০৮ কোটি ভোটারের দেশ বাংলাদেশ, যদিও শত শত রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় তাহারা লক্ষভ্রষ্ট।সকল দলকে একত্রে সীমিত সংখ্যক অর্থাৎ সমমানের দল যৌথ সংগঠন দল সৃষ্টির লক্ষ্যে আত্ননিয়োগ । সকল সমমানের দলের অর্থাৎ যৌথদলের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করি। দলীয় নেতানেত্রীর অধিকার সামাজিক, মানসিক ও আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিবেশ সৃষ্টিতে মনোযোগী হই। রাজনীতি প্রত্যেক নেতানেত্রীর জন্য আশির্বাদ এমনকি প্রত্যেক দলীয় কর্মীর জন্য মঙ্গলজনক পথ।

প্রত্যেক দলের প্রতি আমার অনুরোধ, আসুন আমরা প্রত্যেক দলের দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নেতানেত্রীর উপহার দেই এবং শত শত দল হতে সম-মানের দল অর্থাৎ যৌথদল সৃষ্টি করি। প্রত্যেক যৌথ দলই বৃহত্তর দল হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে , দলীয় বৈষম্য পরিহার হয়, যোগ্যদলের কাতারে আমরা আমাদের দলকে সম্পৃক্ত করি বা সমর্থন দেই। যথাসময়ে সম-মানের দল বা যৌথ সংগঠন দলের সদস্য আহরণের ব্যবস্থা করি। কর্মী সদস্যদের স্বীকৃত সরুপ সনদপত্র প্রদান করি এবং প্রথা চালু করি। সনদপত্র সকল কর্মকান্ডের জন্য গ্রহণযোগ্য, দলীয় পরিচয় ও পরিচিতির জন্য স্বীকৃত। এজন্য জনগণকে দলীয় স্বীকৃতিস্বরুপ মূল্যায়ন করি। দলীয় সনদ সকল দলীয় কাজে বৈধতার চাবিকাঠি।

কোন সদস্যপদ গ্রহণ ছাড়া নেতানেত্রীর আসনের প্রতিযোগীতায় আসা সম্ভব না। যাহার সনদপত্র নাই তাহার দলীয় পরিচয় নাই। কিন্তু সনদপত্র গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেক সদস্যের দলীয় কার্যালয়ে অর্থাৎ তৃণমূল কার্যালয়ে ধারাবাহিক নিয়মে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা রাজনৈতিক সদস্য পদ পাওয়ার অন্য কোন বিকল্প পথ থাকবে না।

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের জন্য চাকুরীর সনদ এবং ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সনদ প্রতিটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কার্যালয়ের প্রতিস্বাক্ষর সহ সনদপত্র গ্রহণ করিতে পারবেন। কিন্তু বিদেশে যে কোন রাজনৈতিক আশ্রয়

প্রার্থী এবং বাংলাদেশী হয়েও অন্য দেশের নাগরিত্ব পাওয়া ব্যক্তি ও দৈত নাগরিত্ব পাওয়া ব্যক্তি এই সনদপত্রের জন্য অযোগ্য। প্রত্যেক শাস্তি পাওয়া অপরাধী এই সনদপত্র পাওয়ার জন্য অযোগ্য।

রাজনৈতিক দলীয় সনদপত্র প্রত্যেক জনগণের রাজনৈতিক জীবনের একটি অংশ। দলীয় পরিচিতি যাহা প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার পথ (সনদপত্র প্রসঙ্গে রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারার বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে)।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে শত শত দলকে বৈষম্যহীন রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি আমাদের দলীয় শৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। দলীয় শৃঙ্খলা ফিরে আসলে স্বাভাবিক ভাবেই সকল সংস্কারের পথ সুগম হবে, রাজনীতির সংস্কার হবে। সুষ্ঠ ধারার রাজনীতিতে জনগনের অধিকার ফিরে আসবে, যৌথ দলীয় সংগঠণ রাজনীতি আশার আলো , যে রাজনীতিতে থাকবে না প্রতিহিংসা, পরনির্ভশীল রাজনীতি, থাকবে না দলীয় করন ব্যবস্হা, থাকবে না দলাদলী , মারামারী ইত্যাদি।

শুধু থাকবে যৌথ দলীয় নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক অধিকারে রাজনৈতিক ভাতা বা অনুদান এবং যৌথ দলীয় সংগঠণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা। আর থাকবে দলীয় নেতা-নেত্রী নির্বাচনে জনগণের অধিকার।

রাজনৈতিক সংস্কার যৌথ দলীয় সংগঠণ প্রতিষ্ঠার অংশ বিশেষ, ফলে রাজনীতিতে আর কোন সংস্কারের প্রয়োজনীতা নেই। বর্তমানে সুষ্ঠ ধারার রাজনীতি ও রাজনীতির নতুন সংবিধাণ বাস্তবায়ন হলে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হবে না, সংস্কার তার নিজ গতিতে চলবে।

শুধু কয়েকটি বিষয় বা ক্ষেত্রের জন্য জবাবদিহিতা প্রয়োজন ঃ-

১) জুলাই ২০২৪ আন্দোলনের আত্নত্যাগের ছাত্র ও নিরীহ মানুষ হত্যার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনা।

২) বিচারকার্যে সম্পৃক্ত প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তিদের অর্থাৎ উকিল-মোক্তার, বিচারক এবং বাদী বিবাদী যে কারো পক্ষপাত আচরণ প্রকাশ পেলে তাহাদেরও শাস্তির আওতায় আনা ।

৩) গুম, খুন, আয়নাঘর প্রসঙ্গে হুকুমদাতা এবং পরিচালনাকারী ব্যক্তি প্রতেক্যের যথাযথ অনুপাতিক শাস্তির আওতায় আনা । ভিক্টিমদের যথাযথ সাহায্য সহযোগীতা প্রদান রাষ্ট্রের এবং রাজনৈতিক দলের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৪) দেশের সম্পদ পাচারকারী, পাচারে সহযোগীতাকারী উচ্চ পদ থেকে নিম্ন পদ পর্যন্ত সকল কে বিচারের আওতায় এনে বিচারকার্য পরিচালনা।

৫) দেশের অর্থ বিদেশে পাচার রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল, এর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত থাকতে হবে।

৬) সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৃত্তশালী হওয়ার পেছনে আয়ের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদের উৎস প্রকাশ এবং শাস্তির আওতায় আনা।

৭) ১৯৯০ সালের পর সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে অসুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশ্ন বিদ্ধ নির্বাচনে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের পরিকল্পনাকারী, সহযোগী ও বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক কে সুষ্ঠু বিচারের আওতায় আনা।

৮) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তির দ্বারা বা রাষ্ট্র পরিচালনা অংশিজন দ্বারা সংধানের শুন্যতা সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল বলে গন্য হবেন, রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তির বিধান মৃত্যুদন্ড। কারন সার্বভৌমত্ব রক্ষার শপথ ভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তি বলে গন্য হবেন।

এই আটটি বিষয়ে তড়িৎ গতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সংস্কারের সকল পথ উন্মুক্ত হবে। এতে দেশের সুস্থ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে আসবে।

রাজনীতির উদ্দেশ্য ঃ-

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে সকল ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ। যথা-মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সম অধিকারে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা। রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে সকল ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদপেক্ষ।

রাজনীতিতে গনতান্ত্রিক নতুন ধারার সংবিধান প্রবর্তন ঃ-

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার বিকশিত করা, বিশেষ করে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বের মাঝে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা। আত্ন মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে সম্মানজনক স্থান প্রতিষ্ঠার লক্ষে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা। রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন অর্থাৎ রাজনীতির নতুন সংবিধান প্রবর্তন করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রাজনীতির মূল সংবিধান তৃণমূল জনগণের নিকট অর্থাৎ জনগণের মাঝে নিয়ে যাওয়া প্রথম পদক্ষেপ।

বর্তমান রাজনীতি একপ্রকার তথাকথিত ব্যবসা মাত্র, কারণ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারলেই বৃত্তশালী ও ক্ষমতাশালী হওয়া যায়, বিশেষ করে টাকার জোরে গুন্ডাপান্ডা পালার ব্যবস্থা থাকে, জনগণকে হুকুমের দাসে পরিণত করা যায়। কথায় আছে, যার নাই গতি সে করে রাজনীতি। কারন বুদ্ধিহীনদের চিন্তাদ্বারা হচ্ছে রাজনীতি টাকার মেশিন। এই সকল অপবাদ মুছে দেওয়ার জন্য প্রতিকার হিসাবে রাজনীতির সত্যিকারের গণতন্ত্র অর্থাৎ সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সকল জনগণকে একই প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য যৌথদলীয় সংগঠনের সৃষ্টি।

বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষমতায়ন ও দূরবিত্তায়ন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সঠিক পথ আবিষ্কার, সে পথের নাম যৌথ সংগঠন রাজনৈতিক পথ। যার সংখ্যা বা আকার সীমিত। যার ফলে বারবার ক্ষমতায় আসার ইচ্ছা, জনগণের সাথে নেতানেত্রীর সুসম্পর্ক, নেতানেত্রীর ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা, তার আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ সুগম করা, জনগণকে সবসময় পাশে পাওয়ার সুব্যবস্থা, তার সম্মান অক্ষুন্ন রাখা এবং তাকে মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। তাই সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থাৎ বহুদলকে একত্রে নিজ দলের অস্তিত্ব বজার রেখে একটি যৌথ দলের প্ল্যাটফর্মে আনা প্রয়োজন, যার নাম যৌথ সংগঠন প্ল্যাটফর্ম। নতুন প্ল্যাটফর্মের নতুন নামকরণ হবে, কারন যাতে কোন সুনির্দিষ্ট দলের বা গুষ্টির স্বার্থ রক্ষা না হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ, সমাজের শেষ পর্যায় অর্থাৎ তৃণমূলে রাজনৈতিক নেতানেত্রীর নেতৃত্ব বিকাশ। সমাজের সর্বপ্রান্তে আদর্শবান নেতা-নেত্রী সৃষ্টি, যার প্রয়োজন সামাজিক বন্ধন, সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব, রাজনৈতিক বন্ধন রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন। যৌথ দলীয় নিবাচন ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন হবে , প্রতিযোগিতা মূলক দলীয় মূল নিবাচন, যার পূর্বে প্রী-নিবাচনে যোগ্যতা যাচাই ব্যবস্থা থাকবে। কোন দলের দলীয় তথাকথিত মনোনয়ন বানিজ্য বিফলে যাবে, দলীয় প্রধানের ইচ্ছার বা মতের বহিঃপ্রকাশ হবে না, যাহা সম্পুর্ন নিষিদ্ধ। জনগণ তার ইচ্ছার প্রতিফলন ভোট প্রদানে স্বক্ষমতা অর্জন ।

বিগত সময়ে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দলগুলির নেতানেত্রীগণ নিজের আখের গোছানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকতো, ইহার ফলে জনগণের সাথে তাহাদের দুরত্ব সৃষ্টি হত এবং জনকল্যাণ থেকে সরে থাকতো, যাহা মোটেও দেশ ও জনগণের মঙ্গলে কাম্য নয়। সকল রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন থাকবে যৌথদলের জন্য। দুটি পাক-নির্বাচন ও মূল নির্বাচন অনুসরণ করে যৌথদলীয় নেতানেত্রী নির্বাচিত হবেন। যাহার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন প্রথা প্রতিষ্ঠিত

করা মূল পদক্ষেপ। দলীয় জোট নামে পরিচিতি পাওয়া দল, যাহার সংখ্যা সীমিত অর্থাৎ কয়েকটি যৌথদল, যে দলে রাজনৈতিক ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা হবে, রাজনৈতিক দলীয় নেতার স্বার্থ রক্ষা হবে এবং দেশের স্বার্থ রক্ষা পাবে, ফলে দুর্নীতি, অপনীতি, অসামাজিক ব্যবস্থার নির্মূল হবে। সকল জনগণকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা এবং নেতৃত্বে আনা রাজনৈতিক সাংবিধানিক পথ সুগম হবে ।

<u>রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা</u>।

শোষণমূক্ত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে রাজনৈতিক সম-অধিকার ব্যবস্থা জরুরী প্রয়োজন। বিশেষ করে বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান প্রত্যেক ব্যক্তি বা সামাজিক সচেতন নাগরিক একত্রে সংগঠিত হলে রাজনীতির সঠিক পথ ও সুষ্ঠু ধারার নীতিগত আদর্শ প্রতিফলণ হবে। যে সকল পথ জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হলেও সংস্কার পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে রাজনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক অধিকার নূতন সংবিধান ব্যবস্থা জাতীয় জীবনে দিক-নির্দেশনার আলোকে দিন বদলের পালায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে, জনজীবনের মান উন্নয়ন, সামাজিক সম অধিকার উত্তরণে প্রতিষ্ঠা পাবে মানবাধিকার। এককথায় রাজনীতি আদর্শ-নীতির ধারা বিবর্তনে দেশ ও জাতীয় কল্যাণ নিহিত। কিন্তু ইহার জন্য গতিশীল রাজনৈতিক সমমানের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন এবং ইহার আপোষহীন নেতৃত্ব প্রদান রাজনৈতিক দলের বহি:প্রকাশ প্রয়োজন।

রাজনৈতিক প্রতিভা বিকাশে সংবিধানিক অধিকারে নূতন রাজনীতির যৌথদলীয় প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার দাবিদার। ফলে ছোট ছোট সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে যথাযথ বড় দলগুলি সম সমান মর্যাদার পদ্ধতিগত ব্যবস্থায় যৌথদলীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর ও একাত্বতা মত প্রকাশে অনুকূলে আনার আবশ্যকীয়তা আছে।

যৌথদলের সংখ্যা সীমিত আকারে হওয়া প্রয়োজন। কারণ আর্থিক অপচয়রোধে কার্যকরী ব্যবস্থার পদক্ষেপ মাত্র। পক্ষান্তরে, সাংগঠনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠন প্রথা ও পদ্ধতি বাস্তবায়ন দলগুলোর জনমানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করা এবং সকল রাজনৈতিক সম অধিকারের প্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমান সময়ের জন্য মূল পদক্ষেপ। যৌথ দলীয় প্রথা বাস্তবায়ন হলে রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ হবে। রাজনীতির গতি পরিবর্তনে সংবিধানে পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

<u>যৌথ দলীয় রাজনীতি উত্তরণের মূল ভূমিকা</u> ঃ-

রাজনীতির মূল উৎস জনগণ অর্থাৎ জনগণের দল। দলীয় রাজনীতি জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলণ। জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন নেতৃত্ব বিকাশ। আর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ার। দেশের ও জনগণের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার মহান দাবিদার।

সকল রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা তাহাদের অধিকার প্রত্যেক দলের জন্য প্রত্যেকেই একটি দূর্গ। কিন্তু তাহার সংখ্যা হাতে গোনা। এমনকি প্রত্যেক দলের দলীয় নেতা-নেত্রীর প্রতি সম্মাণ প্রদর্শন পূর্বক একাধিক যৌথদলে সম্পৃক্ত ব্যবস্থার ফলে নেতা-নেত্রীর সম্মান বৃদ্ধির পথ সুগম হবে, তাহাদের নিজ দলীয় নেতৃত্ব বজায় রেখে যৌথদলের নেতৃত্বে আসার ফলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণ-মানুষের সমর্থিত দলগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাব পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য দেওয়া , বর্তমানে যে সকল দলের জনসমর্থন বেশী তাহাদের সাথে ছোট ছোট দলগুলি মিলে মিশে যৌথদল বিবেচনায় আনা হয়াছে। বিশেষ করে যৌথদলের সংখ্যা সীমিত করা মূল কারণ যৌথদলের নেতা-নেত্রীর আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অর্থাৎ তাহাদের মাসিক ভাতা প্রদান, আরো কারণ হলো যৌথদলীয় নেতা-নেত্রীর সংগঠন নির্বাচন এবং সংসদীয় নির্বাচন

ব্যয় তাহার সমর্থিত যৌথদল বহণ করিবে। কোন দলীয় ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি হতে মুক্ত রাখা হবে। তার কারণ প্রত্যেক যৌথদলের কর্মীদের দলীয় সংগঠনে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে চাকরি প্রদান এবং আর্থিক বেতন প্রদান। যেখানে ভাতার প্রচলণ থাকবে সেখানে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আদর্শবান রাজনীতি প্রতিষ্ঠা পাবে, আদর্শবান নেতা-নেত্রীর ফলে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি তরান্বিত হবে। দেশের উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

রাজনৈতিক যৌথদল প্রতিষ্ঠার মূল সূত্র ঃ-

যৌথ দলের উদ্দেশ্য সামাজিক স্বার্থ এবং জন ব্যক্তির স্বার্থ, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থ। যাহার জনস্বার্থে নানামূখী পদক্ষেপের ফলে দেশের মঙ্গল জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অবসান হতে রক্ষা। বিশেষ করে আধিপত্য বিস্তার প্রতিরোধ, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, অনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরণ, এমনকি দূর্নীতির মত সমাজিক ব্যাধি দূর করার মহা শক্তি।

যৌথ দলীয় মহাশক্তি সকল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখার দাবিদার, যৌথ দলীয় রাজনীতি সংগঠকিন অধিকারে মূল্যায়ন , দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রে একত্রিত করে গণমূখী কল্যাণে গতিশীল রাজনীতির লক্ষে যৌথদলীয় সম-মানের স্বনির্ভর ও আত্ন নির্ভরশীল দল প্রবর্তন ও আত্ন প্রকাশ। ফলে রাজনীতিতে সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম-মানের দল সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

বিশেষ করে নানাবিধ সমস্যার উত্তরণে অর্থাৎ গতিশীল রাজনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, সুশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাযথ উত্তরণে যৌথদল আশার আলো। রাজনীতির স্বার্থকতা শতভাগ পূরণে সক্ষম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংগঠন যৌথদল। যৌথদল সৃষ্ঠির সূত্র বা ফরমুলা,

বর্তমানে দেশে লোকসংখ্যার প্রায় ১৮.৪৫ কোটি ,ভোটারের সংখ্যা সর্বসাকুল্য ১৩.০৮ কোটি। যাহার বিভাজনে রাজনৈতিক দলীয় ভোটার (সনদপ্রাপ্ত)=৯.৯৬ কোটি + প্রবাসী ভোটার (সনদপ্রাপ্ত)=০.৭০কোটি মোট=১০.৬৬কোটি এবং নিঃ-দলীয় (দেশীয়+প্রবাশী) ভোটার মিলে ১.২০+০.২২)=১.৪২ কোটি,= সর্ব মোট ১২.০৮কোটি বিবেচনায় নিয়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠি অর্থাৎ সমমানের দল প্রতিষ্ঠার লক্ষে, বর্তমানে প্রচলিত ৩০০টি সংসদীয় আসন সমান ৩০০টি সংগঠণ এলাকার বিন্যাসে দলীয় ও নিঃদলীয় ভোটার সমন্নয়ে যৌথ দল নির্ধারিত, সনদ প্রাপ্ত ভোটার /৩০০টি সাংগঠনিক এলাকা=যৌথ দলের সংখ্যা নির্নয়,

যেমন ১২.০৮ কোটি/৩০০=৪.০২৬৬ লক্ষ=৪.০৩লক্ষ ভোটার মাত্র একটি অঞ্চলিক অঞ্চলের জন্য। একটি অঞ্চলিক অঞ্চলের বিভাজনে একটি যৌথ দলের সর্বনিম্ন নির্ধারিত ভোটারসংখ্যা ৬৪,০০০। উক্ত সংখ্যার আলোকে যৌথদল নির্ধারিত (৪.০৩ লক্ষ /৬৪০০০)= ৬.২৯= ৬টি দল প্রস্তাবিত ।

শুধুমাত্র জাতীয় নিবাচন ও অর্থনৈতিক উন্নতির মহাযজ্ঞে আগামী দিনের বাস্তব স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যৌথ রাজনৈতিক সংগঠন দল সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা গণতন্ত্রের মূল সেতুবন্ধন মাত্র।

সকল প্রকার মতভেদ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় দলীয় অস্তিত্ব রক্ষা, সভা সমাবেশ, রোড মার্চ, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিষয় মাথায় রেখে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার পদ্ধতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন তরান্বিত হবে। বিশেষ করে সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে এক কাতারে আনার পরিকল্পনায় যৌথদল।

সমাজের যৌথদল প্রত্যাশা সম-অধিকারের জন্য, দেশ গড়ার মহান কাজের জন্য, স্বাধীন সত্তার মূল্যায়ন এবং জবাবদিহীতার প্রশ্নে আপোষ। রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার এবং সকল ভারসাম্য রক্ষায় সমমানের যৌথ দল প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ সমাধান মাত্র।

রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার যে কোন দলীয় লোকজন তাহার নাগরিক অধিকারের বলে যে কোন দলের অর্থাৎ যৌথ সংগঠন দলের সনদপ্রাপ্ত সদস্য হতে পারবেন। কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই।

আবার যে কোন দলের নেতানেত্রী তাহার যোগ্যতা বলে দলীয় নেতা-নেত্রীর নির্বাচন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু তাহাকে নির্বাচনী বৈরিতা অর্থাৎ পাক-নির্বাচন ও মূল দলীয় নির্বাচন জয়লাভের পর সংসদীয় পদের নির্বাচনে অংশ নিতে সক্ষম ব্যক্তি। এখানেও সামাজিক গণতন্ত্রের সকল ধারার নিয়মনীতি অনুসরণ হবে। উক্ত প্রথায় নেতা নেত্রী নির্বাচনের জন্য তৃণমূল যৌথ সংগঠন হতে কেন্দ্রীয় যৌথ সংগঠন দলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবে না।

জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন বৈরিতার জন্য দলীয় সংগঠনে দুটি পাক-নির্বাচনের অংশ গ্রহন এবং দলীয় মনোনয়ন নিয়ে মূল নির্বাচনে অংশ নেওয়া জন্য অর্থাৎ সকল প্রকার রাজনৈতিক দলীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করেও আদর্শনীতি অনুসরণ করে সম-মানের যৌথদলীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমমানের বৃহত্তর যৌথদলের আত্নপ্রকাশের ফলে অরাজনৈতিক দল, উপদল, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী দল এবং ছাত্র রাজনৈতিক প্রথা রহিত হবে এবং কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকবে না।

কোন রাজনৈতিক দলের দলীয় অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না, তাহার দলীয় কর্তৃত্ব তাহার নিজের দলেই থাকবে, এক কথায় শুধু রাজনৈতিক কর্মপন্থায় জাতীয় নির্বাচনের জন্য যৌথদলে একাত্বতা ঘোষনা এবং ইহার মূল কারণ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি।

জনগনের মঙ্গল, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত, সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা, যৌথ দলের মাধ্যমে ছোট বড় সকল দলকে এক কাতারে ও যৌথদলীয় পরিচয়ে নেতা-নেত্রী বিকাশ রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

যৌথদলের বাধ্যবাদকতা হলো প্রত্যেক নাগরিকের স্থায়ী ঠিকানায় (বাপ-দাদার ঠিকানা) জাতীয় পরিচয় পত্র এবং স্থায়ী ঠিকানায় সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে। কোন নেতানেত্রী সদস্য পদ সনদ না থাকিলে যৌথদলীয় নির্বাচনে ও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

দেশের লোক সংখ্যা, ভোটার সংখ্যা এবং দলীয় ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়া সীমিত সংখ্যক সমমানের যৌথদল প্রতিষ্ঠা নীতিগত পদক্ষেপ। যৌথদলের সদস্য (সনদপ্রাপ্ত) একদল হতে অন্যদলের ১০% ভাগ কমবেশী হতে পারে। কিন্তু যৌথদলের ভোটার সংখ্যা অর্থাৎ সদষ্য সংখ্যা সর্বনিম্ন নির্ধারিত, একটি যৌথদলের আঞ্চলিক এলাকার ভোটার ৪.০৩ লক্ষ এবং ইহার ১০% কম ৩.৬৩ লক্ষ নিদ্ধারিত ।

যৌথদলীয় নেতা-নেত্রীর আর্থিক সচ্ছলতা পূরণে দল বদ্ধ পরিকর। কারণ রাজনীতিতে শৃংখলা ও জবাবদিহীতা, লক্ষমাত্রা অর্জনে অর্থায়ন পদ্ধতি সম-অধিকারের জন্য মাইলফলক পদক্ষেপ মাত্র।

দলীয় জনগণের চাঁদা ও অনুদান এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান ও উক্ত লগ্নি টাকার মুনাফাসহ এবং সুষম বন্টনে অগ্রণী ভূমিক পালনে স্বক্ষমতা অর্জন। যাহা যৌথদলীয় কর্মকান্ডে ও জাতীয় নির্বাচনে ব্যয় হবে।

সমমানের বৃহত্তর যৌথদল সম অধিকারে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনে উন্নতর শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষে অংশীদারিত্ব বজায় রাখার মূল চালিকা শক্তি ৬টি রাজনৈতিক যৌথ দল বিবেচনায় নির্ধারিত।

দেশের সকল ছোট বড় রাজনৈতিক দলের দলীয় সমর্থনে আনুপাতিক হার বিবেচনা করে, নতুন যৌথ দলের প্রস্তাবিত সংখ্যা ৬টির নামকরণ, অর্থাৎ

যৌথদলের রুপরেখা-

১। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট - Progressive Democrate Coalition (PDC)

২। জাতীয় ঐক্য জোট - National Unity Alliance (NUA)

৩। জাতীয় জামায়াত জোট - National Jamayat Joth. (Jamat)

৪। জাতীয় নাগরিক জোট - National People Joth. (NPJoth)

৫। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট - National Democratic Joth. (NDJoth)

৬। জাতীয় সামাজিক কোয়ালিসন - National Social Coalition (NSC)

সংগঠনে যৌথ দলের ফলে অর্থাৎ ৬টি দলের সমন্বয়ে জনগণের কল্যানে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এবং দেশ পরিচালনার আলোকে সমঅধিকার প্রশ্নে আত্ন বিশ্বাসী। সংগঠন প্রথা সকল দলের দলীয় যোগ্য নেতা নেত্রীর অধিকার ফিরে আসবে । ফলে প্রত্যেকটি যৌথ দলীয় সংগঠন তাহার দলীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অংশদারিত্ব ফিরে পাবে। রাজনীতিতে দলীয় সদস্য সংখ্যার সক্ষমতা আহরণে সচেতনতা ফিরে আসবে। অর্থনৈতিকভাবে দলীয় উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যৌথদলের আত্নপ্রকাশ যে কোন দলের দলীয় অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষেত্রে যৌথদল আর্শিবাদ।

যৌথদলের ফলে দেশের স্বার্থ, দলের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ এবং জনগনের ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার প্রতিফলন মাত্র।

রাজনৈতিক সংগঠন প্রথা বাস্তবায়ন প্রসংঙ্গে ঃ-

বর্তমানে দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলি অর্থাৎ ছোট বড় সকল দলকে একত্রিত করে নতুন নামকরণে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে নানাবিধ সমস্যার উত্তরণে অর্থাৎ গতিশীল রাজনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, সুশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাযথ উত্তরণে যৌথদল আশার আলো। রাজনীতির স্বার্থকতা শতভাগ পূরণে সক্ষম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংগঠন ।

সকল প্রকার মতভেদ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় দলীয় অস্থিত্ব রক্ষা, সভা সমাবেশ, রোড মার্চ, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে আইন শৃংখলার অবগতির বিষয় মাথায় রেখে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন তরান্বিত হবে।

সমাজের যৌথদল প্রত্যাশা সম অধিকারে, দেশ গড়ার মহান কাজে আত্ন নিয়োগ। স্বাধীন সত্তার মূল্যায়ন এবং জবাবদিহীতার প্রশ্নে আপোষ। রাজনৈতিক বৈষম্য দূর সকল ভারসাম্য রক্ষায় সমমানের যৌথ দল প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ সমাধান মাত্র।

রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার যে কোন দলীয় লোকজন তাহার নাগরিক অধিকারের বলে যে কোন দলের অর্থাৎ সংগঠন দলের সনদপ্রাপ্ত সদস্য হতে পারবেন। কোন প্রকার বাধ্যবাদকতা নাই।

আবার যে কোন দলের নেতানেত্রী তাহার যোগ্যতা বলে দলীয় নেতা-নেত্রীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু তাহাকে নির্বাচনী বৈরিতা অর্থাৎ দুইটি পাক-নির্বাচন সহ মূল দলীয় নির্বাচন অতিক্রম করে জয়লাভের ফলে যৌথদলের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হবেন। আবার যৌথদলের মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। এখানেও সামাজিক গণতন্ত্রের সকল ধারার নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে। উক্ত প্রথার নেতা নেত্রী নির্বাচনের জন্য তৃণমূল যৌথ সংগঠন হতে কেন্দ্রীয় যৌথ সংগঠন দলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবে না।

জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন বৈরিতার জন্য দলীয় সংগঠনে দুইটি পাক-নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন নিয়া মূল নির্বাচনে অংশ নেওয়া অর্থাৎ সকল প্রকার রাজনৈতিক দলীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে আদর্শনীতি অনুসরণ করে সমমানের যৌথদলের সমন্বয় দেশের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সামাজিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে আসবে।

সম-মানের বৃহত্তর যৌথদলের আত্নপ্রকাশে অরাজনৈতিক দল, উপদল, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী দল এবং ছাত্র রাজনৈতিক প্রথা রহিত হবে এবং কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকবে না। কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অস্তিত নষ্ট হবে না। তাহার দলীয় কর্তৃত্ব তাহার নিজের দলেই থাকবে।

এক কথায় শুধু রাজনৈতিক কর্মপন্থায় জাতীয় নির্বাচন ও যৌথদলের নেতা-নেত্রীদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য অনুদান বা সালামী প্রদানে এবং দলীয় সংগঠন প্রথার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতার পরিবেষ এবং বার বার ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবণতা সংগঠন প্রথা প্রচলণে যৌথ দল ব্যবস্থার ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। রাজনীতিতে সাংগঠনিক অধিকার ফিরে আসবে। দেশ ও জনগণের মধ্যে অংশীদারিত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিকার সংরক্ষণ হবে। সংগঠন প্রথা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হবে, সংগঠন প্রথার উত্তরণে সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হবে এবং নেত্বত্ব বিকাশে সংগঠন প্রথা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, জবাবদিহীতামূলক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জিবিত করা হবে। ধর্ম যার যার, উৎসব তাহার নিজের এবং রাজনীতিক সকলের জন্য সমঅধিকার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ছোট বড় সকল দল নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সর্বজন স্বীকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থবহ হবে। জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষমতা অর্জন হবে। বাক-স্বাধীনতা ও মতামতের অগ্রাধিকার দেওয়ার পথ সুগম হবে। প্রধানত: দেশ হতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হবে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ হবে।

বাক-স্বাধীনতা ও বিশ্বাস অগ্রাধিকার দেওয়া এবং জন জীবনে শান্তি ফিরে আসার বিষয় উত্তরণ রাজনীতিতে সংগঠন প্রথা প্রচলণ মূল ভূমিকা রাখবে। সংগঠন ব্যবস্থার জন্য তৃতীয় বিশ্বে একটি উন্নয়ণশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

সংগঠন প্রথা সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিভাজন প্রয়োজন।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক অধিকারে ৩০০টি সংসদীয় আসন নির্ধারিত ছিল, ইহার ৩০০টি এলাকাও নির্ধারিত। যাহার ধারাবাহিকতার অনুকূলে ৩০০ টি যৌথ দলীয় সংগঠন এলাকার প্রবর্তন। যাহার নামকরণ আঞ্চলিক সংগঠন এলাকা। এলাকাভিত্তিক বিষয় রূপান্তর সংখ্যা ৩০০টি সংগঠণ এলাকা। পুনরায় ৩০০টির মধ্যে একটি আঞ্চলিক

আঞ্চলকে বিভাজন তিনস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংগঠণের ক্ষমতাকে সমাজের দোরগোড়ায় তৃনমূলে পৌছানোর বা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে মূল্যায়ন। সংগঠণ এলাকার বিভাজন পদ্ধতি,

০১। আঞ্চলিক সংগঠন এলাকা = ০১ টি (৩০০টির মধ্যে)
০২। বিভাগীয় সংগঠন এলাকা = ০৪ টি (৩০০X৪=১২০০টি)
০৩। নির্বাহী সংগঠন এলাকা = ১২ টি (৩০০X১২=৩৬০০টি)
০৪। তৃণমূল সংগঠন এলাকা = ৭২ টি (৩০০X৭২=২১৬০০টি)

উক্ত বিভাজন এলাকা প্রতিটি যৌথদলের জন্য নির্ধারিত,যাহার সংখ্যা সর্বমোট ২৬,৭০০টি। ছয়টি যৌথদলের জন্য মোট সংখ্যা ১,৬০,২০০টি, সকল সংগঠন এলাকার কর্তৃত্ব প্রধান যৌথদলের মধ্যে অর্পিত থাকবে। যৌথদল ও সংগঠন প্রথা বাস্তবায়নে জন মানুষের আস্থার প্রতিফলণ হবে, সম অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, জনগণের মধ্যে আর্থিক স্বক্ষমতা ফিরে আসবে, ফলে যৌথদলীয় অধিকারে যৌথ সংগঠন প্রথা বা পদ্ধতি বাস্তবায়নে জন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১) <u>যৌথদলীয় সাংগঠনিক রাজনীতির ফলে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ঃ-</u>

০১) প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ যৌথদলীয় সংগঠনের জনগণের (সনদ প্রাপ্ত সদস্য) স্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার অর্জন।

০২) প্রতি বৎসরে ১.৫০ কোটি জনমানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নানাবিধ কর্মপন্থায় আর্থিক সচ্ছলতার পথ সুগম হবে এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান কার্যকারী ভূমিকা রাখবে।

০৩) যৌথদলীয় নেতানেত্রীদের আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য মাসিক সালামি হিসেবে অর্থনৈতিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে, যাহা যৌথদলের তৃণমূল সংগঠন হতে প্রধান দলীয় সংগঠন পর্যন্ত সকল নেতানেত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। সংগঠনে কার্যনিবাহী কর্মকান্ডে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান। (যার সংখ্যা ২০ লক্ষ)

০৪) প্রবাসীদের মর্যাদা রক্ষায় দেশের অর্থনৈতিক চাকা ঘুরে দাড়াবে। কারণ বৈধপথে প্রবাসীদের টাকা দেশে আনা শতভাগ নিশ্চিত হবে।

০৫) বিলুপ্তির পথে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। যাহাকে সচল ও আধুনিকায়ন করা হলে এক লক্ষ আট হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

যেমন- তৃণমূল এলাকায় একটি করে নতুন শাখা অফিস খোলা, যার সংখ্যা দাঁড়াবে ২১,৬০০টি। কারণ তৃণমূল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এবং প্রবাসীদের টাকা পাঠানোর নির্দিষ্ট স্থান হিসাবে এবং আমানত রাখার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে, যাহা সকল ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

০৬) যৌথ দলীয় ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রসার লাভ করবে। সুদ মুক্ত ঋণ ব্যবস্থা তৃণমূল জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক। দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে। জন-মানুষের সকল মৌলিক অধিকার এবং ভাত ও ভোটের অধিকার সংরক্ষণ হবে।

০৭) যৌথ দলীয় ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থায় (মাইক্রেডিট লোন) দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শতভাগ সফল হবে।

০৭) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা জনজীবনের গতিপথে পরিবর্তনে সহায়ক হবে। দলীয় ও নি:র্দলীয় সকল সদস্যকে সুদ মুক্ত ঋণের আওতায় আনা হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের মূলধন যৌথ দলীয় সংগঠন যোগানদাতা হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

০৮) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা দেশের জনমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে। প্রতিটি যৌথদলের আঞ্চলিক এলাকার (৩০০ টির মধ্যে একটি) বাৎসরিক আয় ৩২.০৫ কোটি এবং বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ৩০.৫০ কোটি টাকা, আয় ব্যয়ের যোগান দাতা হিসাবে থাকবেন যৌথদলীয় সংগঠনের সদস্যগণ ।

০৯) যৌথ দলীয় ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রীয় অনুদান, যৌথদলীয় সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা ও বিশেষ ব্যক্তিদের বাৎসরিক অনুদান এবং লগ্নি টাকার আয় একত্রে জনকল্যাণে ব্যয় হলে রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আসবে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হবে।

১০) প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রায় উন্নয়নের গতিশীল ব্যবস্থা ফিরে আসবে। বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ এর পূর্ণতা লাভ হবে এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পথ সুগম হবে।

১১) ডাক বিভাগ ব্যাংক সিস্টেমে সকল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ হিসাব চালু করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত: প্রবাসীগণ উক্ত ব্যাংকিং সিস্টেমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে বাধ্য থাকিবে। নতুবা তাহার প্রবাসীমর্যাদা সনদ বাতিল হবে।

১২) প্রতিটি সংগঠন দলের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ছোট হইতে বড় প্রকল্প প্রণয়ন করে ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হবে, যেমন-পশুপালন, মাছ চাষ, ছোট খাট যানবাহন ব্যবস্থা এবং কৃষি কাজের সহায়তা ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।

১৩) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনার আওতায় সুদ মুক্ত ঋণ ব্যবস্থাপনা তৃণমূলে প্রসার লাভ করবে। ঋণ ব্যবস্থা সহনশীল করা হবে। ফলে ঋণ খেলাপী শূন্যের কোটায় চলে আসবে। যে কোন ঋণ দেওয়ার সীমা নির্ধারিত থাকবে।

১৪) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ডাক বিভাগ দ্বারা তৃণমূল মানুষের হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়া হবে। দলীয় সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ফলে দলীয় সংগঠনে দূর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৫) ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া ও নেয়া বিষয়টির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ হবে। আত্ন সামাজিক মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। জনগণের অভাব লাঘব হবে।

১৬) যৌথ দলীয় সংগঠন নির্বাচনে এবং জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যয়ভার প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য তাহার নিজ যৌথদল অর্থাৎ আঞ্চলিক সংগঠন বহন করিবে। কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত অর্থদন্ড হবে না। ফলে নির্বাচনে অপশক্তি ও দূর্নীতি অবসান হবে। ইহার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করতে সহায়ক হবে।

১৭) স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় তাহার এলাকাধীন ৬টি যৌথ দল মিলে বহন করবে এবং ইহার জন্য জোগান দাতা হিসাবে আঞ্চলিক সংগঠন সমন্বয় সাধন করবে।

১৮) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যৌথ সংগঠন প্রথা বাস্তবায়ন হলে দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক দূর্নীতি, অপ-রাজনীতি এবং রাজনীতিতে দলীয় সংঘাতের অবসান হবে।

(২) <u>যৌথ দলীয় রাজনীতিতে অধিকার সংরক্ষণ</u>

০১) যে কোন দল যৌথদলীয় প্রথা বা পদ্ধতির প্রচলনে বহুবার ক্ষমতায় থাকা বা আসার যোগ্যতা অর্জন করবে। দলীয় নেতা-নেত্রীর যোগ্যতার সহায়ক মাপকাঠি উচ্চ শিক্ষা।

০২) প্রত্যেক যৌথদলীয় সদস্য এবং নিঃর্দলীয় সদস্য সমন্বয়ে একে অপরের সাহায্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সমাধানে বদ্ধপরিকর।

০৩) কোন দল ই পরনির্ভরশীল দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রত্যেকটি যৌথদল সমমানের দলে পরিণত হবে।

০৪) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার হলে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের অবসান হবে। এমনকি আগামী দিনের ক্ষমতাসীন দল ও ঐ সময়ের নির্বাচন কমিশনের অধীনে সাংবিধানিক নিয়মে নির্বাচন হবে, কারন নির্বাচন ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত থাকবে।

০৫) স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে, কিন্তু প্রতিটি সংগঠন দুই স্তরে যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মূল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। তাহারা কোন যৌথ দলের সদস্য হতে পারবে না। তাহারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নিঃর্দলীয় সদস্য পদ (সনদ) গ্রহণ করিতে পারিবে।

০৬) বিদ্রোহী প্রার্থী কোন নির্বাচনে থাকবে না (যৌথ দল বা স্বতন্ত্র) ।

০৭) প্রতি পাঁচ বছর পর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু সংসদ থাকবে না। সকল দলের বা সুশীল সমাজ হইতে সীমিত সংখ্যক সদস্য নিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা গঠিত হইবে। যাহার সংখ্যা ২০-২২ সদস্যের উপরে নয়।

০৮) রাষ্ট্রপতির নির্দেশের আলোকে নির্বাচন পরিচালিত হবে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন শুধু প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করিবে, নির্বাচন কমিশনের কোন বক্তব্য বা নির্দেশনা দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে না।

০৯) নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান এবং হাল নাগাদ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

১০) নির্বাচন পদ্ধতিগত ভুলের সমাধানে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নির্বাচন পরবর্তী প্রতি পাঁচ বছর পর পর ঐ সময়ের ত্বত্তাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে। কারণ হলো, পদ্ধতিগত ভুল সংশোধনে নতুন রাজনৈতিক সংবিধান ধারা প্রবর্তন।

১১) পরিসংখ্যান হিসাবে দেশ বাঁচান ও নিজে বাঁচার চেষ্টা করুণ। সকলের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য অংশীদারিত্ব বজায় রাখুন।

৩) রাজনীতির নতুন সংবিধান ধারার প্রতিফলন ঃ-

স্বাধীনতার পর ৫৩ বছরেও রাজনীতির মূল্যায়ন দৃশ্যমান হয়নি। শুধু কালক্ষেপন, সময়ের পরিবর্তন। কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব গণতন্ত্রের পূর্ণ রুপদান প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। শুধু কথায় ছিল গণতন্ত্র, আর কাজে ছিল স্বৈরাচারী মনোভাব।

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন নেই বলে প্রতীয়মান। জনমানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিছবি নিস্ফল। সর্বক্ষেত্রে কাহারো কোন ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। দারিদ্রের হার নিম্নমূখী- যাহার মাত্রা ৭৭% এর নিচে। মূল কারন হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, রাজনীতিতে বৈষম্য প্রতীয়মান। সকল ক্ষেত্রে অবিচার-অনিয়ম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির সমীকরন, রাজনীতির নিয়ম নীতির দালিলিক নীতিকথা অনুপস্থিত। জনমানুষকে এক কাতারে আনার কোন সাংবিধানিক পথ সৃষ্টি হয়নি। যাহার ফলে একবিংশ শতাব্দির প্রথম প্রহরে অগোছালো রাজনীতি পরিলক্ষিত।

রাজনীতি গণতন্ত্রের মূল কারিগর। যাহার নীতি নৈতিকতা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কাম্য। রাজনৈতিক প্রতিভা গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। এই চালিকাশক্তি গঠনের জন্য চাই সঠিক নিয়মতান্ত্রিক নীতিমালা। এই নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং জনগণকে রাজনীতিতে শামিল বা উদ্বুদ্ধ করা, বিশেষ করে জনগণের স্বার্থ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ সম-অধিকারে দেখা।

সম-অধিকার সমাধানে বা উত্তরণের জন্য চাই নতুন ধারার রাজনীতি। যে রাজনীতি সকল বৈষম্যের অবসানে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

বিশেষ করে জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সঠিক পথে চলার পথ প্রদর্শক **"রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্র"** সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন।

রাজনীতির সমীকরণে জনমানুষকে এক কাতারে শামিল করার জন্য রাজনৈতিক সংবিধানকে সংস্কার করা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির মূল প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রথম পদক্ষেপ।

রাজনীতি একটি কর্মপন্থার নাম, মৌলিক অধিকারের নাম। যার দ্বারা সমঅধিকারের পথ সৃষ্টি, রাজনীতিতে ভালো মন্দের ভারসাম্য রক্ষার প্রতিফলন এবং রাজনীতিতে হতাশা দূর করার স্বপ্ন- শ্রেণীবিন্যাস মানুষিক বিবেচনাকে মূল্যায়ন দেওয়া। রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন করা গণতন্ত্রের আরোও একটি ধাপ। রাজনৈতিক দলের দলীয় নেতানেত্রীদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ দেখানো। কথায় আছে কোন মানুষ বিনা স্বার্থে মাঠে দৌড়ায় না। যেখানেই মূল্যায়ন সেখানেই স্বার্থ থাকতে হবে। চাকুরীর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। পরিশ্রমের ফলন চাকুরী এবং মাস শেষে বেতন ভাতা পাওয়া অনিবার্য। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীরা দলীয় কর্মচারী, তাদের পরিবার সংসার আছে। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অভিভাবকদের। দূর্নীতি ও অনৈতিক কাজের মাত্রা বা বেকারত্বের অভিশাপ দূর করার জন্য রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের ভাতা দেওয়ার জন্য সংস্কার প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে ৫৪ হাজার বর্গমাইলের ছোট রাষ্ট্রটির জন্য ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ মৌলিক অধিকার। কারণ একবিংশ শতাব্দীর ৫০ সালে এসে লোকসংখ্যা দাড়াবে ৩৬ কোটির মত। এখানেও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকবেলা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে যৌথ দলীয় ব্যবস্থা অনিবার্য। চাকুরীজীবিদের মূলধন শুধু মেধা, শ্রমশক্তি আর সততা। তাহার সততা সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ রাজনীতি।

আর রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের ক্ষমতা ও সঠিক সহযোগীতা পাওয়া দেশ গড়ার কাজে মাইলফলক ব্যবস্থা।

বিশেষ করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত, মেধাবী ও পরিশ্রমী নেতানেত্রী দেশের জন্য কল্যাণকর। তাদের সততা উচ্চ আসনে নেওয়ার সিড়ি।

পৃথিবীর সর্ব প্রান্তে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে শিক্ষিত পেশার বিকল্প নেই। রাজনৈতিক সংস্কার হলে দলীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যয়ভার তাহার নিজ দল বহনে সক্ষম। কোন ব্যক্তির অর্থদন্ড কাম্য নহে। এখানে শিক্ষিত ব্যক্তির মূল্যায়ন হবে। দলীয় গণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক সংস্কার পদ্ধতি রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের মূল্যায়ন শতভাগ নিশ্চিত হবে।

রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পেনশন ভাতা তাহার মৃত্যু পর্যন্ত চাকুরী শেষে বেতন পাওয়ার অধিকার সংরক্ষন হবে। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার দেওয়া নমিনী আরোও ১২ বছর পর্যন্ত বেতন পাওয়ার অধিকার রাখবে। যদি পরবর্তীতে তাহার পরিবারে প্রতিবন্দি বা তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য থাকে তাহারা আজীবন অর্থ ভাতা পেয়ে থাকবেন। এখানে তৃতীয় লিঙ্গকে সমাজে বসবাসের অধিকার সংরক্ষণ হবে।

রাজনৈতিক দলীয় নেতানেত্রীদের দলীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী বলার অধিকার রাখে। তাদের আর্থিক সহযোগীতার জন্য কোন একাধিক বার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলে (৪ X ২ = ৮ বছর) তাহার বেতনভাতা ও ১০% ভাতা কর আরোপে কর্তন করা হবে। তাহার বয়স সীমা ৫০-৬৫ বছর অতিক্রম হলে সরকারী অনুদান হিসাবে মৃত্যু পর্যন্ত পেনশন ভাতা দলীয় কোটা হতে প্রাপ্য হবেন। কোন প্রকার অনিয়ম প্রমাণিত হলে পেনশন ভাতা বাজেয়াপ্ত হবে।

ফলে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ফিরে আসবে। নীতি নৈতিকতার প্রসার লাভ হবে। কিন্তু বেতন ভাতার অধিকার শুধু যৌথদলীয় সংগঠন ১,৬০,৫০০ টির এবং ইহার নেতানেত্রীর সদস্য সংখ্যা ৯.১৩ লক্ষ পর্যন্ত ক্রমে উক্ত ভাতার আওতায় থাকবে।

২১ লক্ষ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আর্থিক ভাতা রাজনৈতিক দলীয় কোটায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাজনৈতিক যৌথদলীয় সংগঠন কার্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নেতানেত্রীর অফিস সময় সরকারী নিয়মে বিদ্যমান থাকবে। কারন তাদের উপস্থিতিতে সেবার মান উন্নয়ন হবে।

গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতির নূতন সংবিধান রচনায় আত্মনিয়োগ দেশের গতিশীল রাজনীতির বহি:প্রকাশ ঘটানো। দেশের বর্তমান সংবিধানের আলোকে রাজনীতির রাজনৈতিক নূতন সংবিধান দল পরিচালনার ক্ষেত্রে শতভাগ অর্জন এবং স্বাক্ষর রাখবে। রাজনৈতিক নূতন সংবিধানের আলোকে ভোটের অধিকার ফিরে আসবে, ফিরে আসবে দলীয় সংস্কারের নূতন ধারার রাজনীতি , যাহার সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক নীতিগত ধারা আদর্শ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ,

যে রাজনীতিতে জনগণকে মূল্যায়ণ করা, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা, যৌথদল ও দলীয় সংগঠন প্রথা বাস্তবায়ন রাজনীতিতে যুক্ত ইত্যাদি বিষয় সমাধান রাজনীতিতে মাইলফলক পদক্ষেপ।

নূতন রাজনৈতিক সংবিধানে নূতন ধারা সন্নিবেশিত- যাহা রাজনৈতিক পরিচালনার দিক-নিদের্শনা।

বিশেষ করে নতুন ধারা উত্তরণের ফলে রাজনীতির কারণে অহেতুক আর কোন তাজা প্রাণ ঝরে যাবে না- দিতে হবে না জীবন বিসর্জন, হবে না কোন মায়ের বুক খালি, বিশেষ করে ভিন্ন মতের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অংশীদারিত্ব থাকবে না, ফলে গণমানুষের কোন আর্থিক ক্ষতি সাধন হবে না। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক কাতারে চলার মহান পথ রাজনীতি। রাজনীতি বৈষম্য দূর করার হাতিয়ার। বর্তমানে দেশে প্রচলিত রাজনীতির পরিবর্তে সামাজিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি অনেক, গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক।

রাজনৈতিক নূতন সংবিধানের ধারাগুলির যথাযথ বর্ননা,

১ম ধারাঃ গণতন্ত্র বিকাশে রাজনীতির মূল্যায়ন ।

২য় ধারাঃ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনগণের অধিকার অর্জন ।

৩য় ধারাঃ রাজনীতিতে যৌথদলীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ।

৪র্থ ধারাঃ দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রথা প্রচলন ।

৫ম ধারাঃ প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ ।

৬ষ্ঠ ধারাঃ যৌথ দলীয় আর্থিক বিষয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভর ব্যবস্থা।

৭ম ধারাঃ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ ।

৮ম ধারাঃ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ও দলীয় নিবাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন ।

৯ম ধারাঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গতিশীল বিচার ব্যবস্থা ।

১০ম ধারাঃ ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা।

১১ম ধারাঃ স্বাস্থ্য সেবা আধুনিকায়নে গতিপথ পরিবর্তন।

১২ম ধারাঃ দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং যানজটমুক্ত নগর প্রতিষ্ঠা।

১৩ম ধারাঃ জাতীয় পর্যায়ে প্রবাসীদের মূল্যায়ন ও গতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

১৪ম ধারাঃ বহিঃবিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ অধিকার স্থাপন।

১৫ম ধারাঃ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকারের উত্তরণ।

রাজনৈতিক নূতন সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশ ও জনগণের মঙ্গল তরান্বিত হবে। সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা পাবে।

উক্ত ১৫টি ধারায় রাজনীতি পরিচালিত হলে দেশের মধ্যে হানাহানী মারামারি, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পারে, প্রতিহিংসার রাজনীতি রহিত হবে। যৌথদলীয় প্রথা প্রচলণ এবং যৌথদলীয় সংগঠন ব্যবস্থা জন মানুষের

ভাগ্য উন্নয়নে সম অধিকারে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। গণতন্ত্রের আলোকে রাজনীতির নতুন সংবিধান বাস্তবায়নের সারমর্ম প্রকাশ করা হলো। দেশে সংবিধানের আলোকে রাজনৈতিক নতুন ধারা কার্যকর করতে সময় প্রয়োজন হবে ৪(চার) বৎসর। এই সময়ের জন্য বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনায় সক্ষমতা থাকবে। বর্তমানে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য না থাকার কারনে যে কোন ধারা সংশোধন-সংযোজন করার সক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের আছে , কিন্তু জনগনের পক্ষে ৬টি যৌথদলের মেন্‌ডেড নিতে হবে।

নতুন রাজনৈতিক সংবিধান ধারা বাংলাদেশ সংবিধানে যুক্ত হলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। মর্যাদার দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। জন মানুষের ভাগ্য খুলে যাবে। দিন বদলের পালায় আমাদের সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হবে, যার প্রতিটি ধারায় অন্তর্নিহিত আছে।

রাজনৈতিক অধিকারে গণতন্ত্র, ১৮.৪৫ কোটি জন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম-সমান যৌথদলের প্রবর্তনে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে আসা। যৌথদলীয় সংগঠনগুলির মানুষিক আচরণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিকশিত, রাজনীতিতে আশার আলো প্রচলণ হবে। উত্থান ও পতন ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা জনগণের মঙ্গলের পথে রাজনীতির দিক-নির্দেশনা।

রাজনীতির নতুন ধারার বিধি-বিধান প্রবর্তনে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে আসবে। রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

জন মানুষের প্রত্যাশার সকল উন্নয়ন দেশের সমৃদ্ধি সাধন, নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদির নিশ্চয়তা আছে বলে এটি একটি উত্তম শাসন ব্যবস্থা।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে যৌথদলীয় সংগঠন ব্যবস্থা জনমানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম-মানের রাজনৈতিক দলগুলি প্রধান হাতিয়ার। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহনশীলতা ও সমঝোতা রাজনৈতিক বন্ধন সৃষ্টি আত্ন নির্ভরশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও নেতৃত্ব বিকাশের উদার ও মানুষিকতার মনোভাব বিদ্যমান, বিশেষ করে সাংগঠনিক সংগঠন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশ ও জাতিকে বিশ্ব পরিমন্ডলে উপলদ্ধি করার প্রত্যয় ব্যক্ত, দেশের সফল রাষ্ট্র নায়ক সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে এসে কৃতিত্বের অধিকারী।

এই অধিকারে উদার মানুষিকতার জন্য দেশরত্ন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস কে আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে বাংলার জনগণ ।

"রাজনৈতিক উত্তরণে নতুন সংবিধান" ধারাগুলির যথাযথ মূল্যায়ন সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক অধিকার বলে দেশের উন্নয়নে মাইলফলক ভূমিকা রাখবে। দেশের উন্নয়নে সমৃদ্ধশালী হিসাবে অর্ধশত বৎসরের পরিবর্তে এক-দশমাংশ বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অধিকারী আমার সোনার বাংলা।

নতুন সংবিধান ধারা জনগনের প্রত্যাশায় আলোকপাত,

ধারা-১

<u>গণতন্ত্র বিকাশে রাজনীতির মূল্যায়ন।</u>

রাজনীতিতে জনগণের অর্জন ও প্রত্যাশা প্রতিফলনে ব্যর্থতা এবং সফলতা দুইটি দুই মেরুর পথ।

রাজনীতিতে নিঃর্দলীয় গণতন্ত্র, একদলীয় গণতন্ত্র এবং বহুদলী গণতন্ত্র আদর্শনীতিতে নিজ নিজ দলীয় দিক নির্দেশনার আলোকে প্রতিফলণ হয়। যাহা গণতন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য ও উপ-দলীয় কোন্দল চরমে। মিমাংসার উপায় সহিংসতাকে ব্যবহার করা হয়। দলগত বৈষম্য অসুস্থ রাজনীতিতে সামাজিক উন্নয়ন বড় বাধা, দলের অবমূল্যায়ন সংঘাতের রাজনীতি উপহার দেয়, ক্ষমতার জন্য সংঘাত। দলীয় অব্যবস্থার মেরুকরণে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য চারিত্রিক পরিবর্তন দলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে।

সুযোগ সন্ধানী জনগণের বৈষম্যনীতিতে জবাবদিহিতা না থাকায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ৩(তিন) প্রকার রাজনীতি। যাহা নিঃর্দলীয় রাজনীতি, একদলীয় রাজনীতি এবং বহুদলীয় গনতন্ত্রের রাজনীতি, দল পরিবর্তনকারী বহিরাগত প্রবেশ অনৈতিক কার্যকলাপের অহেতুক জন্ম দেয়। যাহার আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ। ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে দূর্নীতির পরিমান সীমাহীন আকার ধারন করে। প্রতিকারে সুব্যবস্থা নেই।

শুধু দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে ব্যক্তি স্বার্থ যে কোন অনিয়ম সামাজিক বন্ধনে ফাটল ধরায়। ফলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। অশুভ শক্তি ভর করে। দলীয় কোন পরিবর্তন বা দলীয় সদস্য পথ পরিচিত না থাকায় দলীয় পরিচয় বিঘ্ন ঘটে। গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশে জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য দলীয় কোঠায় প্রাথমিক দলীয় পরিচিতি সনদ না থাকায় দলীয় সদস্য পরিচিতি ছাড়া জনগণের সম্পৃক্ততা কোনক্রমেই দলকে সুসংগত করা সম্ভব নহে। যাহা বহুদলীয় গণতন্ত্রে নেই।

সুষ্ঠু ধারার রাজনীতিতে নির্বাচন ভোটের অধিকার সংরক্ষণ করে। যাহার সমাধান গণতান্ত্রিক ধারার সম-মর্যাদাবান দল সৃষ্টির লক্ষে দলীয় রাজনীতি কাজ করে। অসুস্থ রাজনীতির ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। হাজারো অনিয়ম দূর্নীতির মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এমনকি তথাকথিত অস্থিরতার কারনে গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি বহুগুণে হ্রাস পায়। গণতন্ত্র বিকাশে জাতীয় নিরাপত্তা দলীয় পরিচয় ছাড়া মোটেও শুভ নয়।

শিক্ষা অঙ্গনে দলীয় অপরাজনীতির কারনে শিক্ষার মান সর্বনিম্নমূখী। উচ্চ শিক্ষাকে বিলাসিতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। আগামীতে অপশক্তির কারনে যুব সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নেওয়ার উপক্রম। কারণ রাজনীতিতে পদায়ন বয়সের কোন সীমা নেই-নেই কোন বাধ্যবাধকতা। শিক্ষাকালীন সময় রাজনীতি শিক্ষার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। শিক্ষা এবং রাজনীতি এক সাথে চলতে পারে না। কারণ শিক্ষার সময় আর রাজনীতির সময় দুইটি দুই মেরুতে অবস্থান কিন্তু শিক্ষা রাজানীতির হাতিয়ার। ইহার অবমূল্যায়ন পারিপার্শ্বিক অনিয়মের জন্য।

প্রশাসনিক জটিলতা সামাজিক অবজ্ঞতার জন্ম দেয়। রাজনীতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অদক্ষ ব্যক্তি ও পুঁজিবাদের আগমনে এবং দলীয় প্রভাবে নিয়োগ বাণিজ্য মাথাচাড়া দেয়। ফলে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূর্নীতি ও অপনীতি ক্যানসারে রূপ নেয়, যাহা দলের জন্য মোটেও কাম্য নয়।

রাজনৈতিক ছত্র-ছায়ায় দলীয় প্রভাব প্রশাসনকে ব্যবহার করা হয়। আর এই সুযোগে দূর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।এই জটিলতা এড়াতে রাজনীতিতে জবাবদিহিতা আনতে হবে। রাজনীতিবিদদের আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকে সৃষ্টি থাকতে হবে। রাজনীতিতে দলীয় নেতা নেত্রীর জ্যেষ্ঠতা এবং মূল্যায়ন করতে হবে। যাহা বহুদলীয় গণতন্ত্রে ছিটাফোটা নেই।

বহুদলীয় গণতন্ত্রে রাজনীতিতে তথাকথিত একতরফ নির্বাচন পদ্ধতিগত ভুলের কারণে জনকল্যাণে মঙ্গল বয়ে আনে না। নির্বাচনকে বহুদলীয় কোঠার ব্যবস্থা করা সমাজের অবক্ষয় মাত্র। ভোটার ভোটদানে অনিহা এবং বহুদলীয় জটিলতার কারণে নির্বাচন পদ্ধতি জনকল্যাণে মঙ্গল আসে না। নির্বাচন তার নিজ গতি হারিয়ে ফেলে এবং অর্থনৈতিক বিষয় চলে আসে। বহুদলের কারণে প্রশাসন ও দলীয় ব্যবস্থা প্রভাবমুক্ত হয় না। ফলে সুস্থ ধারার রাজনীতি অনুপস্থিত। নির্বাচন পদ্ধতিতে ভুলের কারণে সামাজিক ভারসাম্য জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। সকল দলের সম অধিকার না থাকায় নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফলে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

দলীয় ভোটারদের দলীয় পরিচয় না থাকার কারণে নির্বাচন জটিলা বহুগুণে বেড়ে যায়। নির্বাচন পদ্ধতিতে ভুল সীমাহীন অপনীতির জন্য ব্যর্থ রাজনীতিতে পরিণত হয়। যে কোন ক্ষমতাশীল দল ক্ষমতায় ও বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীন নির্বাচন সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক ধারায় রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা প্রতিফলন থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া তার নিজ গতিতে চলতে দিতে হবে। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্গন করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষাতে নির্বাচন পদ্ধতিগত ভুল সংশোধনে সামাজিক গণতন্ত্রের ধারা বিবর্তনে অবাদ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় আর্থিক ক্ষতির মাত্রা কমে যাবে।

প্রধানত: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণ ক্ষেত্রে বহুদলের বহুদলীয় প্রার্থী পরিচয় না থাকার কারণে ভোট গ্রহণ জটিলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আর্থিক অপচয় বৃদ্ধি পায়-সময়ক্ষেপণ হয়। নানা জটিলতার ভুয়া ভোটারের মাত্রা বৃদ্ধি হয়। যাহার বাস্তব চিত্র বিগত ৫০ বৎসরে নির্বাচনগুলি। নির্বাচন কমিশন অতিমাত্রায় মাথা ঘামায় বলে তাহারা প্রশ্নবিদ্ধ । ফলে বহুদলীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

গত ১৫ বছর নির্বাচন ব্যবস্থা একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত ছিল, জন মানুষের ভোটের অধিকার হরন করা হয়েছে, কাহার বাক-স্বাথিনতা ছিল না, সকল রাজনৈতিক দলগুলি মেরুডন্ডহীন অবস্থানে ছিল। শুধু চাঁদা আর চাঁদা,ঘুষ আর ঘুষের রাজত্ব, দূনীনি আর টাকা পাচার মহা উৎসবে দিন চলত, মনে হয়েছে সোনার বাংলা সর্গ রাজ্যের দেশ।

সোনার বাংলাকে জন মানুষের মাঝে তাদের সকল অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য **রাজনৈতিক উত্তরণে নতুন সংবিধান** (যা দেশের সংবিধান নয়) ধারা রাজনৈতিক দলীয় জনগনের মাঝে তাদের মঙ্গলের জন্য তুলে ধরা ।

ধারা-২

রাজনীতিতে জনগণের অধিকার অর্জন ও বাস্তবায়ন।

রাজনীতিতে জনগণের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা বা অর্জন।

দেশ ও জনগনের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক গণতন্ত্রের আগমন। দেশে ও দলের উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষে জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিকভাবে রাজনীতিতে আগমন। যে অধিকারে রাজনীতিতে নাগরিক জীবন ধারার আমল পরিবর্তন হয়।

ইহার বাস্তবতায় আইনের অধিকারের শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যমান যেমন- (০১) নাগরিক অধিকার

(০২) সামাজিক অধিকার ও (০৩) রাজনৈতিক অধিকার।

০১)নাগরিক অধিকার ঃ

যে অধিকারের বলে জন্মসূত্রে নাগরিক অধিকার অর্জন করা হয়। যাহা রাজনীতির ধারার নিরপেক্ষ অধিকার হিসাবে অর্জন। একটি শিশু জন্মের পর তাহার অধিকার মা-বাবার পরিচয় জন্মগত অধিকার। উক্ত অধিকার বলে তাহার পরবর্তী অধিকারের পালা শুরু হয়, যেমন-তার নাম রাখা, পিতা-মাতার পৈতৃক অধিকার। আর পরবর্তী অধিকারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য জন্ম সনদ প্রদান করিয়া নাগরিক অধিকার ১ম বৎসরেরর মধ্যে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এবং প্রয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রীয় একটি সংস্থার প্রয়োজন হয়। যাহা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করবে এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। যে প্রতিষ্ঠানের তৃর্ণমূল এলাকা পর্যন্ত সেবাদানের সক্ষমতা আছে ইহার নাম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সে কোন দেশের সকল নাগরিক তাহার জন্মগত অধিকারে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনে সক্ষম এবং মর্যাদা দান জন্মগত সূত্রের নাগরিক যোগ্যতা অর্জনে তাহার জন্মই তাহার স্বার্থ রক্ষার প্রমাণ। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করত জন্মসূত্রে তাহার নাম রাখার পর তাহার জন্মগত অধিকার স্বীকৃতি হিসাবে ২য় প্রাপ্ত জন্ম নিবন্ধন সনদ।

একটি শিশু জন্ম গ্রহনের সময় হতে ১ম বৎসরের মধ্যে সঠিক জন্ম তারিখ ও নাম এবং স্থায়ী ঠিকানা (বাপ দাদার ঠিকানা) সহ স্থানীয় সেবাদান প্রতিষ্ঠানে তাহার পিতামাতা আবেদন করিবেন। ৭ম কার্যদিবসের মধ্যে সেবাদান প্রতিষ্ঠান জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের জন্য সক্ষম। নীতি নৈতিক দায়িত্ব অবহেলার জন্য সেবাদান প্রতিষ্ঠান আইনতো দন্ডিত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হবে। উক্ত সনদ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন দশায় একবারই প্রাপ্ত। কিন্তু বাবা-দাদার পৈতৃক ভিটেমাটি ঠিকানা সংযোগ বাধ্যতামূলক।

একটি শিশুর ক্ষেত্রে পরবর্তী নাগরিক জীবনের অধিকারের ১ম পরিচিতি। ইহা তাহার জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষা, বিবাহ এবং কর্মক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। উক্ত সনদ ব্যতিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ১ম বাধা।

দ্বিতীয় ধাপ জাতীয় পরিচয় পত্র সংগ্রহের সময়। পরবর্তীতে শিশুর ১৮ বৎসর ১ দিন পূর্ণ হলে রাষ্ট্রীয় অধিকার হিসাবে, অর্থাৎ নাগরিক অধিকারের ২য় ধাপ অর্জনে সক্ষম ব্যক্তি। রাষ্ট্রীয় অধিকার হিসাবে জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার অধিকার রাখে। তাই তাহার বাবা-দাদার পৈতৃক ঠিকানা সহ স্থানীয় সেবাদান প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার প্রেক্ষিতে আবেদন করিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, তাহার বাবা-দাদার স্থানীয় ঠিকানা অথবা পিতা-মাতার কর্মস্থল ঠিকানা অথবা বর্তমান ঠিকানায় আবেদন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু জাতীয় পরিচয় পত্রে বাবা-দাদার ভিটেমাটির ঠিকানা উল্লেখ বাধ্যতামূলক। সেবাদান প্রতিষ্ঠান আবেদনগুলি ৭ম কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় উপজেলা বা থানা নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ আবশ্যক। নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয় পত্র প্রস্তুত করত সেবাদান প্রাপ্তি স্থানে অথবা ব্যক্তির ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানে সংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার ১ম শর্ত জন্ম নিবন্ধন সনদ সহ আবেদন, প্রয়োজনে শিক্ষা সনদ থাকতে পারে।

২য় শর্ত হলো আবেদনের ২০/- টাকার ডাকটিকিট সংযোগ করত সীল তারিখ ও ক্রমিক নাম্বার এবং ডাক বিভাগের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

উপসংহার ঃ প্রত্যেক নাগরিক তাহার সাংবিধানিক ও জন্মগত অধিকারে সক্ষমতা অর্জন করিবেন। উভয় সনদের বেলায় এবং ইহা প্রাপ্তির জন্য নাগরিক অধিকার অর্জনে সচেতন হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য। উক্ত সনদ প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের সুযোগ নাই। যাহা গণতান্ত্রিক অধিকারে তথাকথিত বিলুপ্তির পথে ডাক বিভাগ সতেজ করার লক্ষে এই প্রয়োগ মাত্র। ১৮ বৎসর ১ দিন পূর্ণ হওয়ার পরে তিন মাসের মধ্যে জাতীয় পরিচয় পত্র সংগ্রহ বাধ্যতামূলক। কারণ জাতীয় পরিচয় পত্র ভোটার হওয়ার বা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইহা ছাড়া তাহার নামে ভোটার তালিকায় সংযোগ হবে না। উক্ত বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তি বা তাহার পিতা-মাতাকে মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিকের ভোটার হওয়ার জন্য ভোটার তালিকায় জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ও স্থায়ী ঠিকানা বলবৎ থাকবে। কোন প্রকার ব্যত্যয় হলে ভোটার হওয়া নিষিদ্ধ।

০২)   সামাজিক অধিকার ঃ

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি তাহার নাগরিক অধিকারের পর সামাজিক অধিকার অর্জন। সামাজিক অধিকার তাহার জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা সকল জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নৈতিক দায়িত্ব। নৈতিক দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার প্রয়োজন আর এই সক্ষমতা তাহার প্রাপ্ত বয়স অর্থাৎ সাবালক। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। যাহা ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে থাকতে হবে। কারণ ১৮ বৎসর বয়সে শিক্ষার ২য় অর্জন সার্টিফিকেট গ্রহন। যাহা উচ্ছ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী সনদ নামে পরিচিত। কিন্তু যাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার পর আর শিক্ষার সুযোগ হয় না তাহাদের জন্য জন্ম সনদ পত্র অনুযায়ী তারিখ গণনা করা হবে। কিন্তু সামাজিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। সাথে তাহার পিতা-মাতার বা তাহার নিজের ধর্মীয় কালচারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী জনগনের নৈতিক দায়িত্ব এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার উর্দ্ধগতি। মাপকাঠীর বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ১৮ বৎসর ১ দিন পূর্ণ হলে ভোটার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ হবে। এক কথায় সামাজিক অধিকারে ভোটার হওয়া তাহার নাগরিক দায়িত্ব। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাহাকে মানবিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ভোটার হতে হলে তাহাকে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করতে হবে এবং তাহার জন্য পদক্ষেপ আরোপ করা হবে।

১ম পদক্ষেপ-

স্থায়ী ঠিকানা অর্থাৎ তাহার বাপ-দাদার পৈতৃক ঠিকানা ব্যবহার হবে। ভোটার তালিকায় নামের পাশে জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার সংযুক্ত থাকবে। ইহা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোন ভোটার তাহার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বর্তমান কর্মস্থল ঠিকানায় ভোটার হতে পারবেন। কিন্তু শর্ত থাকবে যে, তাহার স্থায়ী ঠিকানা এবং এন.আই.ডি নাম্বার সংযোজন থাকতে হবে।

২য় পদক্ষেপ-

ভোটার তালিকা দুই বৎসর অন্তর অন্তর প্রকাশ করা হবে। আবার জাতীয় সাধারন নির্বাচন (সংসদ নির্বাচন) সময় তিন মাস পূর্বে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে। ইহার দায়িত্ব ও কর্তব্য উপজেলা বা থানা নির্বাচন কমিশনের।

৩য় পদক্ষেপ-

উক্ত ভোটার তালিকা জেলা নির্বাচন কমিশন দ্বারা যাচাই-বাছাই এর পর বিভাগীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাবে। কোন প্রকার জটিলতা দেখা গেলে ভোটার আরজি পেশ করিলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন দ্বারা আপিল কোর্ট হিসাবে কমিটির মাধ্যমে শুনানীতে বাদীর উপস্থিতিতে নিষ্পত্তি করিয়া ভোটার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করা হবে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার বেলায় উক্ত নিয়ম বলবৎ থাকবে।

৪র্থ পদক্ষেপ-

যদি কোন ভোটার যে কোন নির্বাচনের পূর্বে তাহার পছন্দমত স্থানে বা ঠিকানায় ভোট প্রদানের জন্য অংশগ্রহণ করিবেন, সেক্ষেত্রে নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে আবেদনের সাথে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকার পোষ্টাল টিকেট সহ স্বাক্ষর ও সীলমোহর ও তারিখ ইত্যাদি (ডাক বিভাগের) নূতন ভোটার স্থানে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নির্বাচন কমিশনে জমা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন যাচাই বাছাই করিয়া ভোটার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করত আবেদনকারীকে অবগত করার দায়িত্ব কমিশনের। কিন্তু উল্লেখ থাকে যে, জাতীয় পরিচয় পত্র ও জন্মগত সনদ নাম্বার পরিবর্তন হবে না এবং কোন ব্যতিক্রম হবে না। পুরাতন ঠিকানায় ভোটার তালিকা হতে নাম প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনকে অবগত করার দায়িত্ব আবেদনকারী ও কমিশনের দায়িত্ব। প্রত্যেক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য একই রূপ নিয়মনীতি বলবৎ থাকবে।

প্রবাসীদের জন্য সামাজিক অধিকার অর্জন ও নৈতিক দায়িত্ব বটে। তাহারা বাংলাদেশের নাগরিক-শুধু চাকরির জন্য বিদেশ। তাহাদের বেলায় জন্ম নিবন্ধন সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্র অবশ্য থাকতে হবে। আরো প্রয়োজন হবে চাকরীর পারমিট ও ভিসার মেয়াদ সহ পাসপোর্ট ফটোকপি। কিন্তু ইহা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশের দূতাবাসের অনুমোদন থাকতে হবে।
বিশেষ করে কোন ব্যক্তির আদালতে শাস্তি প্রমাণিত হলে শাস্তি ভোগ করার সময় ভোটার হতে পারবে না। কিন্তু হাজতীরা ভোটার হতে পারবেন। তাহারা স্থায়ী ঠিকানায় আবেদনের মাধ্যমে ভোটার হতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কারাগারের জেলারের প্রতি স্বাক্ষর সহ সীল মোহর সহ আবেদনটি সংশ্লিষ্ট নির্বাচন (স্থানীয়) কমিশনের নিকট পৌছাইতে হবে। কিন্তু তাদের বেলায়ও জন্ম সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্র ঠিকানা ব্যবহার হবে। কিন্তু তাহার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তাহার ভোট দেওয়া যেমন তাহার স্থায়ী ঠিকানা বা তাহার বর্তমান উপস্থিতির স্থানে ভোটার হতে বা ভোট প্রয়োগ ব্যবস্থা থাকবে।

০৩) রাজনৈতিক অধিকার ঃ-

রাজনীতি সুশাসনের মেরুদন্ড। গণতন্ত্রের মূল্যায়নে রাজনীতির বিকল্প নেই। রাজনীতিবিদ দ্বারা গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়। ফলে দেশের স্বার্থ জনগনের স্বার্থ এবং জনব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ সকল নাগরিকের সামাজিক অধিকার। প্রধানত সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতির মূল লক্ষ ও সামাজিক বন্ধন অর্জন।
রাজনীতির স্বার্থকতাঃ- জনগনের সৎ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মনের ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্র এবং ইচ্ছার প্রতিফলন-ভোটদানের অধিকার অর্জন ইত্যাদি। প্রথমেই রাজনীতি করা সময়ের সীমারেখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ বুদ্ধিমত্তা বিকশিত না হলে রাজনীতির হাতেখড়ি দেওয়া নিষ্ফল। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনীতি করা ভাগ্যের উপর আঘাত করা। আর কারণ অরাজনীতিবিদদের হুকুমের গোলাম এবং হাতিয়ার হওয়া ছাড়া কোন অবকাশ নেই। রাজনীতির জন্য রাজনীতির শিক্ষা প্রয়োজন আর এই শিক্ষা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়ে থাকে। আর তাহাদের আদর্শ অনুসরন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পথে হাটতে হবে।

কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শনীতি অনুসরণ একে অপরের পাশে আপদে বিপদে দাড়ানো, এমনকি একগোত্রের প্রতিনিধি অন্য গোত্রের সকল বিপদে আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক অর্জন সকলের জন্য সমান অধিকার।

রাজনীতির সামাজিক ক্ষেত্র তৃণমূল পর্যায়ে-

এখানে সামাজিক বন্ধনে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের বহি:প্রকাশ নীতিগত মানুষিক বিকাশ প্রতিফলন মাত্র। ইহাকে রাজনীতির প্রথম অধ্যায় বা ধাপ বলা চলে। প্রত্যেক নাগরিক বা দলীয় কর্মী তাহার মনোনীত দলের সদস্য হওয়া কর্তব্য এবং সদস্য সনদগ্রহণ করা তাহার ব্যক্তিগত অধিকার। দল তাহার নিবন্ধন তালিকা প্রণয়ন করবে এবং সদস্য সনদ বিতরণ করিবে। উল্লেখ্য যে, নাগরিক অধিকারে রাজনীতি হলো সামাজিক গণতন্ত্র অর্জনে হাতিয়ার।

রাজনীতি কর্মী হওয়ার যোগ্যতার জন্য বয়সের প্রয়োজন হয়। ইহার সীমারেখা ২২ বৎসর ১ দিন। রাজনীতি করার বিষয় শিক্ষা সময় পার করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষার সমাপনী সময় বলা হয় ২২ বৎসর পর্যন্ত।(অর্থাৎ ১৬ বৎসর এস.এস.সি পরবর্তী ধাপ এইচ.এস.সি, বি.এ এবং এম.এ) এবং সমমানের শিক্ষা সময় ০৬(ছয়) বৎসর পার করতে হয়। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য বয়সের প্রয়োজন হয় না। ২২ বৎসর ১ দিন বয়সে রাজনীতিতে প্রবেশের সময় হতে পারে, উক্ত বয়স নির্ধারিত বলে বিবেচিত। এই বয়সে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা-কর্মযজ্ঞ শুরু। কিন্তু নাগরিকের শিক্ষার পিছুটান থাকছে না। তাই সামাজিক গণতন্ত্রের রাজনীতির বয়স শিক্ষা ২২ বৎসর ১ দিন। এক কথায় ১৮ বৎসর ১ দিন হতে ভোটে অংশগ্রহণ এবং ভোট দেওয়ার এখতিয়ার।

২২ বৎসর ১ দিন হইতে রাজনীতিতে প্রবেশ অধিকার অর্জন এবং দলীয় সনদপ্রাপ্ত সদস্য পদ পাওয়ার পর রাজনীতিতে আগমন সকলের দলীয় সাংগঠনিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। একজন নাগরিক তাহার ইচ্ছার প্রতিফলন ও তাহার মনোনীত দলের সদস্য হতে পারবে। এখানে বাধ্যবাদকতা নেই। প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তি চিন্তা ও তাহার মতামত প্রতিফলনে তাহার মনের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য রাজনৈতিক দলীয় অধিকার প্রয়োজন। দলীয় নীতিগত মত প্রকাশের ফলে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। দলগত বৈষম্য দূর করার জন্য, দলীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য, দলীয় আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য, রাজনৈতিক অধিকারে বহুদলকে কয়েকটি বৃহত্তর সম মর্যাদাবান দলে পরিণত করা রাজনৈতিক দলের জন্য সেতুবন্ধন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৭৭.৫৮% মানুষ নিম্ন আয়ের সীমার মধ্যে। উক্ত বিশাল জনগোষ্ঠিকে সাবলম্বী করার প্রচেষ্টা রাজনীতির চালিকাশক্তি। সামাজিক গণতন্ত্রের মূলনীতি সম অধিকার বাস্তবায়ন। ফলে রাজনীতির মূল্যায়ন স্বার্থক হবে। সকল জনগণকে রাজনৈতিক দলীয় কোঠায় সনদ প্রাপ্ত দলীয় সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক অধিকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একজন নাগরিক নেতৃত্বে পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক অধিকারে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বে আসতে হবে।

রাজনীতিতে দলীয় সদস্যপদ এবং নিঃদলীয় সদস্য পদ যে কোন পদে সদস্য হওয়ার সাংগঠনিক দলীয় অধিকার অর্জন মাত্র। রাজনীতিবিদ বা কর্মী হলেই তাহার দলীয় আচরণবিধি পালন এবং সদস্য পদ গ্রহনের পর তাহাকে জবাবদিহীতায় আসতে হবে। ইহাই রাজনীতির মূল স্বার্থকতা ও অধিকার। রাজনীতির অঙ্গনে জনগণ ক্ষমতার উৎস তাই যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

নেতা-নেত্রীর আগমন গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার বলে রাজনৈতিক সংগঠন প্রথায় গণতান্ত্রিক মর্যাদাবান সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে রাজনৈতিক স্বক্ষমতার প্রয়োজন। রাজনৈতিক যৌথ দলীয় সংগঠন অর্থবহ করার লক্ষে সকল রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্র রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন জবাবদিহীতার ক্ষেত্রে, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও মানুষিক এবং সাংগঠনিক রাজনৈতিক বন্ধন অপরিসীম ক্ষেত্র। জনগণের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে দলীয় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের ফলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। ফলে রাজনীতির মূল্যায়ন হবে। সকল রাজনৈতিক যৌথ দলগুলি দলীয় ভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করা, সমাজ ও দেশ রাজনৈতিক ভাবে বহিঃ বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, ফলে এই দেশটি উন্নত দেশের কাতারে দাড়াবে-এই প্রত্যাশা আমাদের।

ধারা-৩

রাজনীতিতে যৌথদল প্রতিষ্ঠা এবং দলীয় অধিকার সংরক্ষণ ঃ-

রাজনীতির মূল উৎস জনগণ অর্থাৎ জনগণের দল। রাজনীতি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলণ। জনগনের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন নেতৃত্ব বিকাশ। আর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ার। ইহার বাস্তবায়ন গণতন্ত্রকে উত্তরণ, বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ছোট বড় অনেক দল। যাহার সংখ্যা প্রায় শতকের উপরে। আবার নামে বে-নামে অনেক দল, তাদের নীতিগত বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক আদর্শের অস্তিত্ব সংকট। অনেক দলের নেতা-নেত্রীর সংখ্যা অনেক, কিন্তু দলীয় কোন্দলে দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত। আবার অনেক দল বহুদলের নিকট নির্ভরশীল ফলে বহুদলীয় প্রথা জনগণের মৌলিক স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আধুনিক গণতন্ত্রের কাতারে সামাজিক গণতন্ত্রে প্রতিফলন দেশের ও জনগনের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং নাগরিকের ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য যৌথ দলীয় সংগঠন প্রথা প্রয়োজন। কারণ দেশের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণতন্ত্রে ধারাবাহিক যৌথ দলীয় রাজনৈতিক প্রথা প্রবর্তন একমাত্র জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলনের জন্য। যাহার ফলে দেশের সকল রাজনৈতিক দলীয় দলাদলি, রাজনৈতিক মতানৈক, মত বিরোধ এবং প্রতিহিংসা ও দলীয় বৈরীতার অনিয়ম এবং দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য যৌথ দল সৃষ্টির বিষয়। যাহার উৎপত্তি ছোট ছোট দলগুলির স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে আত্নপ্রকাশ।

যৌথদলের মূল উদ্দেশ্য ঃ-

যৌথ দলের উদ্দেশ্য সামাজিক স্বার্থ এবং জন ব্যক্তির স্বার্থ, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থ। যাহার জনস্বার্থে নানামূখী পদক্ষেপের ফলে দেশের মঙ্গল জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অবসান হতে রক্ষা। বিশেষ করে আধিপত্য বিস্তার প্রতিরোধ, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, অনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরণ, এমনকি দূর্নীতির মত সমাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব হবে।

যৌথ দলীয় মহাশক্তি সকল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অধিকার রাখবে। যৌথ দলীয় রাজনীতি সংগঠন অধিকারের মূল্যায়ন যথাযথভাবে প্রতিফলণ । এমনকি দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রে একত্রিত করে গণমূখী কল্যাণে গতিশীল রাজনীতির লক্ষে যৌথদলীয় সমমানের স্বনির্ভর ও আত্ন নির্ভরশীল দল প্রবর্তন ও আত্ন প্রকাশ। ফলে রাজনীতিতে সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম-মানের দল সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

বিশেষ করে নানাবিধ সমস্যার উত্তরণে অর্থাৎ গতিশীল রাজনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, সুশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাযথ উত্তরণে যৌথদল আশার আলো। তাই রাজনীতির স্বার্থকতা শতভাগ পূরণে সক্ষম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংগঠন যৌথদল।

যৌথদল সৃষ্ঠির সূত্র বা ফরমুলা:

বর্তমানে দেশে লোকসংখ্যার প্রায় ১৮.৪৫ কোটি ,ভোটারের সংখ্যা সর্বসাকুল্য ১৩.০৮ কোটি। যাহার বিভাজনে রাজনৈতিক দলীয় ভোটার (সনদপ্রাপ্ত)=৯.৯৬ কোটি + প্রবাসী ভোটার (সনদপ্রাপ্ত)=০.৭০কোটি মোট=১০.৬৬কোটি এবং নিঃ-দলীয় (দেশীয়+প্রবাশী) ভোটার মিলে ১.২০+০.২২)=১.৪২ কোটি,= সর্ব মোট ১২.০৮কোটি বিবেচনায় নিয়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠি অর্থাৎ সমমানের দল প্রতিষ্ঠার লক্ষে, বর্তমানে প্রচলিত ৩০০টি সংসদীয় আসন সমান ৩০০টি সংগঠণ এলাকার বিন্যাসে দলীয় ও নিঃদলীয় ভোটার সমন্নয়ে যৌথ দল নির্ধারিত, সনদ প্রাপ্ত ভোটার /৩০০টি সাংগঠনিক এলাকা=যৌথ দলের সংখ্যা নির্নয়,

যেমন ১২.০৮ কোটি/৩০০=৪.০২৬৬ লক্ষ=৪.০৩লক্ষ ভোটার মাত্র একটি অঞ্চলিক অঞ্চলের জন্য। একটি অঞ্চলিক অঞ্চলের বিভাজনে একটি যৌথ দলের সর্বনিম্ন নির্ধারিত ভোটার সংখ্যা ৬৪.০০০, উক্ত সংখ্যার আলোকে যৌথদল নির্ধারিত (৪.০৩ লক্ষ /৬৪০০০)= ৬.২৯= ৬টি দল প্রস্তাবিত ।

শুধুমাত্র জাতীয় নিবাচন ও অর্থনৈতিক উন্নতির মহাযঞ্চে আগামী দিনের বাস্তব স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যৌথ রাজনৈতিক সংগঠন দল সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা গণতন্ত্রের মূল সেতুবন্ধন মাত্র।

সকল প্রকার মতভেদ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় দলীয় অস্থিত্ব রক্ষা, সভা সমাবেশ, রোড মার্চ, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিষয় মাথায় রেখে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার পদ্ধতি ফলে দেশের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন তরান্বিত হবে।

সমাজের যৌথদল প্রত্যাশা সম-অধিকারের জন্য, দেশ গড়ার মহান কাজের জন্য, স্বাধীন সত্তার মূল্যায়ন এবং জবাবদিহীতার প্রশ্নে আপোষ। রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার এবং সকল ভারসাম্য রক্ষায় সমমানের যৌথ দল প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ সমাধান মাত্র।

রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার যে কোন দলীয় লোকজন তাহার নাগরিক অধিকারের বলে যে কোন দলের অর্থাৎ সংগঠন দলের সনদপ্রাপ্ত সদস্য হতে পারবেন। কোন প্রকার বাধ্যবাদকতা নেই।

আবার যে কোন দলের নেতানেত্রী তাহার যোগ্যতা বলে দলীয় নেতা-নেত্রীর নিবাচন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু তাহাকে নির্বাচনী বৈরিতা অর্থাৎ পাক-নির্বাচন ও মূল দলীয় নির্বাচন অতিক্রম করে জয়লাভের ফলে যৌথদলের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি। আবার যৌথদলের মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য পদের নির্বাচনে অংশ নিতে সক্ষম ব্যক্তি। এখানেও সামাজিক গণতন্ত্রের সকল ধারার নিয়মনীতি অনুসরণ হবে। উক্ত প্রথায় নেতা নেত্রী নির্বাচনের জন্য তৃণমূল যৌথ সংগঠন হতে কেন্দ্রীয় যৌথ সংগঠন দলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবে না।

জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন বৈরিতার জন্য দলীয় সংগঠন পাক-নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন নিয়া মূল নির্বাচনে অংশ নেওয়া জন্য অর্থাৎ সকল প্রকার রাজনৈতিক দলীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করা, আদর্শনীতি অনুসরণ করে সমমানের যৌথদলের সমন্বয় দেশের সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ হবে।

সম-মানের বৃহত্তর যৌথদলের আত্মপ্রকাশে অরাজনৈতিক দল, উপদল, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী দল এবং ছাত্র রাজনৈতিক প্রথা রহিত হবে এবং কোন প্রকার অস্থিত্ব থাকবে না।

কোন রাজনৈতিক দলের অস্থিত্ব নষ্ট হবে না। তাহার দলীয় কর্তৃত্ব তাহার নিজের দলেই থাকবে। এক কথায় শুধু রাজনৈতিক কর্মপন্থায় জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য যৌথদলে একাত্বতা ঘোষনা এবং ইহার মূল কারণ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি।

জনগনের মঙ্গল, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত , সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা, যৌথ দলের মাধ্যমে ছোট বড় সকল দলকে কাতারে, যৌথদলীয় পরিচয়ে নেতা-নেত্রী বিকাশ রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিপ্রকাশ।

যৌথদলের বাধ্যবাদকতা হলো প্রত্যেক নাগরিকের স্থায়ী ঠিকানা (বাপ-দাদার ঠিকানা) জাতীয় পরিচয় পত্র এবং স্থায়ী ঠিকানায় সদস্য পদ গ্রহণ করিতে হবে। কোন নেতানেত্রী সদস্য পদ সনদ না থাকিলে যৌথদলের নির্বাচনের অংশ নিতে পারিবে না।

দেশের লোক সংখ্যা, ভোটার সংখ্যা এবং দলীয় ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়া সীমিত সংখ্যক সমমানের যৌথদল প্রতিষ্ঠা নীতিগত পদক্ষেপ। যৌথদলের সদস্য (সনদপ্রাপ্ত) একদল হতে অন্যদলের ১০% ভাগ কমবেশী হতে পারে। কিন্তু যৌথদলের ভোটার সংখ্যা ও সদষ্য সংখ্যা সর্বনিম্ন নির্ধারিত, অর্থাৎ একটি যৌথদলের আঞ্চলিক এলাকার ভোটার ৪.০৩ লক্ষ এবং ইহার ১০% কম ৩.৬২ লক্ষ নিদ্ধারিত মাত্র, যা সংগ্রহ যোগ্য।

যৌথদলীয় নেতা-নেত্রীর আর্থিক সচ্ছলতার পূরণে দল বদ্ধ পরিকর। কারণ রাজনীতিতে শৃংখলা ও জবাবদিহীতা, লক্ষমাত্রা অর্জনে অর্থায়ন পদ্ধতি সম-অধিকারের জন্য মাইলফলক পদক্ষেপ মাত্র।

দলীয় জনগণের চাঁদা ও অনুদান এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান ও উক্ত লগ্নি টাকার মুনাফাসহ এবং সুষম বন্টনে অগ্রণী ভূমিক পালনে স্বক্ষমতা অর্জন।

সমমানের বৃহত্তর যৌথদল সম অধিকারে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনে উন্নতর শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষে অংশীদারিত্ব বজায় রাখার মূল চালিকা শক্তি মাত্র। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক দলীয় সংখ্যাগরি

উদাহরন সরুপ রুপ রেখা,

দেশের মোট ভোটার সংখ্যা = ১৩.০৮ কোটি

দলীয় ভোটার (সনদ প্রাপ্ত সদস্য) সংখ্যা = ১০.৬৬ কোটি

(দেশে বসবাসরত =৯.৯৬ কোটি+ প্রবাসী = ০.৭০ কোটি)

নিঃ দলীয় ভোটার (সনদ প্রাপ্ত সদস্য) সংখ্যা = ১.৪২ কোটি

(বসবাসরত =১.১৮ কোটি+ প্রবাসী = ০.২৪ কোটি)

প্রশাসনিক ভোটার সংখ্যা = ০.৫৫ কোটি

নতুন ভোটার সংখ্যা = ০.৪৫ কোটি

(১৮বছর-২২বছর পর্যন্ত)

মোট ভোটার সংখ্যা = ১৩.০৮ কোটি

দলীয় ভোটার(সনদ প্রাপ্ত সদস্য) + নিঃ দলীয় ভোটার সংখ্যা=১০.৬৬+১.৪২ =১২.০৮কোটি

বিবেচনায় নিয়ে দলের সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে ৩০০ টি সাংগঠনিক অঞ্চল এলাকার
একটির জন্য ভোটার সংখ্যা = ১২.০৮ কোটি / ৩০০ = ৪.০৩ লক্ষ (একটি অঞ্চল)
আনুমানিক একটি যৌথ দলের জণ্য সর্বনিম্ন ৬৪,০০০ ভোটার ধরে বিভাজনে দলের সংখ্যা নির্নয়,৪.০৩,লক্ষ / ৬৪,০০০ = ৬.২ = ৬টি যৌথ দল ।

৬ টি রাজনৈতিক যৌথ দল বিবেচনায় নির্ধারিত।

লোক সংখ্যা এবং ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়া দেশের সকল সকল ছোট বড় রাজনৈতিক দলের দলীয় সমর্থনে আনুপাতিক হার বিবেচনা করে , নতুন যৌথ দলের প্রস্তাবিত নামকরণ, যথা-

প্রস্তাবিত সংখ্যা= ৬টির নামকরণ, যথা-

১। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট - Progressive Democrate Coalition (PDC)

২। জাতীয় ঐক্য জোট - National Unity Alliance (NUA)

৩। জাতীয় জামায়াত জোট - National Jamayat Joth. (Jamat)

৪। জাতীয় নাগরিক জোট - National People Joth. (NPJoth)

৫। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট - National Democratic Joth. (NDJoth)

৬। জাতীয় সামাজিক কোয়ালিসন - National Social Coalition (NSC)

সংগঠনে যৌথ দলের ফলে অর্থাৎ ৬টি দলের সমন্বয়ে জনগণের কল্যানে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এবং দেশ পরিচালনার আলোকে সমঅধিকার অধিকার প্রশ্নে আত্ন বিশ্বাসী। সংগঠন প্রথা সকল দলের দলীয় যোগ্য নেতা নেত্রী সক্ষমতা অর্জনে অধিকার ফিরে পাবে। ফলে প্রত্যেকটি যৌথ দল সংগঠন তাহার দলীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অংশদারিত্ব ফিরে পাবে। রাজনীতিতে দলীয় সদস্য সংখ্যার সক্ষমতা আহরণে সচেতনতা ফিরে আসবে। অর্থনৈতিকভাবে দলীয় উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, যৌথদলের আত্নপ্রকাশ যে কোন দলের দলীয় অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষেত্রে যৌথদল আর্শিবাদ।

ধারা-৪

রাজনৈতিক যৌথ দলীয় সংগঠন প্রথা এবং প্রতিফলনঃ

ভূমিকাঃ
বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক দল আছে, আছে বহুদল, আছে অনেক ছোট ছোট দল। আরো আছে বহুদলীয় মতবাদের কার্যকারিতা। বিশেষ করে পরিলক্ষিত সামান্য স্বার্থহানী হলেই একে অপরের বিরোদ্ধাচারণ মনোভাব পোষণ করতে দ্বিধা করে না। দ্বিতীয় সম-অধিকার প্রশ্নে দ্বিধাভক্ত। ফলে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। বিশেষ করে গণতন্ত্রে মূল চালিকা শক্তি সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মূল সংসদীয় ব্যবস্থা। উক্ত ব্যবস্থায় বর্তমান সময় দেশ পরিচালিত আছে। বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক অনিহা জনমানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আছে শুধু একে অপরের প্রতি বিদ্বেষিত আচরণ। ফলে শ্রদ্ধাচিত মনোভাব শূন্যের কোটায়। পক্ষান্তরে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থবহ করার লক্ষে মূল সংসদকে প্রাণবন্ত করার লক্ষে সামাজিক গণতন্ত্রের বিশেষত্ব হলো সংগঠন প্রথার আদলে সংসদীয় ব্যবস্থা।

সংসদকে প্রাণবন্ত করার লক্ষে সংগঠন প্রথা সম-অধিকারের সম-মানের দলের সমন্বয়ে রাজনীতির কল্যাণ সাধন উত্তম পরিপন্থী। যাহা সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক ভারসাম্য রক্ষার সেতুবন্ধন মাত্র। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষেত্রে চলমান বৈশ্বিক সংকট নিরসন হবে। ফলে রাজনৈতিক অচল অবস্থার প্রতিকার এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়ানোর লক্ষে সংগঠন প্রথা বাস্তবায়ন মূল উদ্দেশ্য।
সংগঠন প্রথার প্রসার লাভ সামাজিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকারে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে যোগ্য নেতৃত্বের আগমন মূল উদ্দেশ্য।
রাজনীতির জন্য রাজনীতি নীতিকথা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং নাগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠায় জনগনের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া। ইহার জন্য জনগনের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন প্রথার বিকল্প নেই।
বর্তমান দেশের রাজনৈতিক ছোট ছোট দলগুলি এবং উপ-দলীয় কোন্দল নিরসন, রাজনৈতিক সহিংসতা দূর করা। রাজনৈতিক মত পার্থক্য প্রতিহত করা বা ব্যবধান কমানোর বিষয়গুলি অর্থবহ করার ক্ষেত্রে রাজনীতির সংগঠন প্রথার বিকল্প নেই।
জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বিরোধী দল ও দলীয় মত গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অনেক দূরে অবস্থান। সমাধানে বিরোধী দলগুলির অনৈতিক মতবাদের কারনে প্রতিহিংসার জন্ম নেয়। তাহার প্রতিকারে সঠিক পথ অবলম্বনে ব্যর্থ এবং দলীয় বিপর্যয় এড়ানো কঠিন পথের মোকাবেলা করার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। সকল ব্যবস্থার উত্তরণে অংশীদারিত্ব বিকেন্দ্রীকরণ সংগঠন ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষায় পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান একমাত্র পথ। যে পথে জন মঙ্গলের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। সম-মানের সংগঠন যৌথদল প্রতিষ্ঠিত হবে।
নি:র্দলীয় ও পেশাজীবী সুলভ জন প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, সক্রিয় সুশীল সমাজ ব্যবস্থায় সংগঠন প্রথা বা পদ্ধতি প্রচলন বাস্তবায়ন মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ছোট ছোট দলগুলি তাহার ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা ব্যতিরেকে দলমত নির্বিশেষ অনৈতিক দল মনের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি বলেই গণতন্ত্র বার বার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যাহার সমাধানে কোন কার্যকরী ব্যবস্থার ভূমিকা অনুপস্থিত।

বিশেষ করে ছোট ছোট দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অবক্ষয় বিদ্যমান। কারণ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার তর্ক-বিতর্কে অশালীন বক্তব্য সংঘাতময় জনপথের রাজনীতির জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। অসমাধানের অন্যতম কারণ আলাপ আলোচনা ও চিন্তাশীল রাজনীতির মত বিনিময় অনুপস্থিত। বিশেষ করে রাজনীতির সংস্কৃতি না গড়ে উঠা। সকল বিষয় সমাধানের একমাত্র পদক্ষেপ রাজনীতিতে সংগঠন ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

অন্যতম পদক্ষেপ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাঝে অর্থনৈতিক আর্থিক সুবিধা ভোগের অধিকার সংরক্ষণ করা। যাহা প্রত্যেক জনমানুষের চলার পথে ব্যক্তি স্বার্থে, দলের স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থ রক্ষায় অন্তর্নিহিত। পৃথিবীতে কোন বস্তু বা জীব স্বার্থের বাহিরে নয়। তাই রাজনৈতিক ভাবে জন মানুষের স্বার্থ রক্ষা হলো তাহার জন্য আর্থিক সহযোগিতা। আর্থিক সহযোগিতার জন্য রাজনীতি করার স্বার্থকতা।

পৃথিবীর ঘন বসতির্পূণ অঞ্চলগুলির মধ্যে আমাদের দেশ অন্যতম। কিন্তু আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের ৩০০০ ভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থানের অধিকারী। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৮.৪৫ কোটি কিন্তু ২০৫০ সাল নাগাদ দ্বিগুণে পরিণত হবে।
ফলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমানে গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং উন্নয়ন ধারার বিকাশ সমান সমান নয়। যাহার মেরুকরণ অর্থনৈতিক উন্নতি আর সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা।

এক কথায় অর্থনীতির আর্থিক উন্নতি জাতীয় মেরুদন্ড। অর্থনৈতিক উত্তরণে আর্থিক সহযোগিতা স্বচ্ছলতার পথ সৃষ্টি করা আগামী দিনের জন্য মেরুকরণ। ইহার জন্য রাজনৈতিক শত ইচ্ছার বহি: প্রকাশ মাত্র। আর্থিক

সহযোগিতার জন্য স্থান-কাল-পাত্র বিশেষ প্রয়োজন। যাহার অনুকূলে সকল জন মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত রা প্রয়োজন। সম-অধিকারে সকল রাজনৈতিক ছোট বড় দলগুলিকে এককাতারে একত্র করার প্রথম পদক্ষেপ। ইহার জন্য সংগঠন ব্যবস্থা অগ্রাধিকার।

বিশেষ করে পরিসংখ্যানবিদদের ধারনা সীমিত আয়তনের দেশে জন সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতন মূল বিষয়। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে রাজনৈতিক বিপ্লব আনা বিশেষ প্রয়োজন। আর এই বিপ্লব একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগোষ্ঠির দক্ষ ও উন্নত করে গড়ে তুলে সম্পদে পরিণত করার জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আর এই সদিচ্ছার প্রতিফলণ রাজনৈতিক সংগঠন প্রথার বিকাশিত পথ।
জনমনে প্রশ্ন স্বচ্ছতা আর নীতিবোধ ও জবাবদিহিতায় নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ। বাঁচার অধিকার সুরক্ষা ইত্যাদি ।

ইহার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধান ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্নে সমাজ গড়ার লক্ষে আমাদের সমাজের চাহিদার আলোকে আর্থিক ব্যবস্থার পথ সুগম করা নাগরিক অধিকার বা কর্তব্য। এই অধিকার বলে বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প যৌথদলীয় সংগঠন মাধ্যম পরিচালিত হলে অর্থনৈতিক উন্নতি তরান্বিত হবে।

যে দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস, সেই দেশের সামাজিক বন্ধনে অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ এবং দারিদ্র বিমোচন স্বক্ষমতা অর্জন বিশেষ প্রয়োজন।
০১. সংগঠন ব্যবস্থার অধিকার প্রতিষ্ঠা।
দেশের সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল জনগোষ্ঠির আমাদের উন্ননের পথে আকস্মিক বাধা। জন সাধারনের মাথাপিছু আয় হ্রাস ও জীবনযাত্রার মান নিম্নমান। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা বেকারত্ব ও নিরক্ষরতার বেড়াজালে গোটা জাতি আজ দিনে দিনে নিমজ্জিতের দিকে।
জাতির পিতার সোনার বাংলা এবং আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হলে সকল জনজরে সচেতন ও সংগঠিত হতে হবে। অধিকার ভিত্তিক উন্নয়নে অংশ নিতে হবে। আমরা রাজনৈতিক অধিকারের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি। পারিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিতে।

ফলে আমাদেরকে সাংগঠনিক পদ্ধতির দিকে হাটা এবং মূল্যায়ন জরুরী বিষয়। সংগঠন প্রথা অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা। সংগঠন প্রথা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নতুন সংবিধান আলোকে পদক্ষেপ একটি ধারা।

রাজনীতিতে জনমানুষের জীবনে দু:খ আছে, গ্লানি আছে, পরাজন আছে, ব্যর্থতা আছে, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। মানুষ তার উদ্যম প্রতিভা, প্রচেষ্টা ও শ্রম ও মেধা বিকাশিত করে সকল ব্যর্থতার জয় করছে এবং সফলতা অর্জন করছে।
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নৈপুণ্যে দক্ষতার শিল্পে সাহিত্যে আবিস্কারে উদ্ভাবনে এবং শ্রম ও সাধনার আলোকিত বিকাশিত উদ্ভাবনে এবং শ্রম ও সাধনায় আলোকিত বিকাশিত উদ্ভাসিত করছে সমাজকে, দেশকে, এমনকি পৃথিবীকে।
বাংলাদেশের জীবন যাত্রার মান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এর জায়গায় থেমে নেই। দিন বদলের পালায় আমরা চলমান সামনের দিকে। অসামান্য সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজের পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষে সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক সংগঠন প্রথা পদ্ধতি প্রচলণ।

সংগঠন প্রথায় প্রত্যেক জনমানুষের অর্থনৈতিক সাবলম্ভী করা মহান পথ। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সকলের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়কত ভূমিকায় যৌথ দলীয় সংগঠন আশার আলো।

বিশেষ করে অংশীদারিত্ব বজায় রাখার প্রত্যাশা। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ভাতা বা সম্মানী ভাতা প্রদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন দিগন্ত রচনা হবে। ফলে লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা-নেত্রীর ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

সংগঠন প্রথা জনগনের সকল আশা পূরণে আর্থিক ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনার আলোকে লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

সকল প্রকার মতভেদ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় দলীয় অস্থিত্ব রক্ষা, সভা সমাবেশ, রোড মার্চ, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে আইন শৃংখলার অবগতির বিষয় মাথায় রেখে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন তরান্বিত হবে।

সমাজের যৌথদল প্রত্যাশা সম অধিকারে, দেশ গড়ার মহান কাজে আত্ন নিয়োগ। স্বাধীন সত্তার মূল্যায়ন এবং জবাবদিহীতার প্রশ্নে আপোষ। রাজনৈতিক বৈষম্য দূর সকল ভারসাম্য রক্ষায় সমমানের যৌথ দল প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ সমাধান মাত্র।

রাজনৈতিক দলীয় সংস্কার যে কোন দলীয় লোকজন তাহার নাগরিক অধিকারের বলে যে কোন দলের অর্থাৎ সংগঠন দলের সনদপ্রাপ্ত সদস্য হতে পারবেন। কোন প্রকার বাধ্যবাদকতা নাই।

আবার যে কোন দলের নেতানেত্রী তাহার যৌগতা বলে দলীয় নেতা-নেত্রীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু তাহাকে নির্বাচনী বৈরিতা অর্থাৎ পাক-নির্বাচন ও মূল দলীয় নির্বাচন অতিক্রম করে জয়লাভের ফলে যৌথদলের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হবেন। আবার যৌথদলের মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নিতে পারিবেন। এখানেও সামাজিক গণতন্ত্রের সকল ধারার নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে। উক্ত প্রথার নেতা নেত্রী নির্বাচনের জন্য তৃণমূল যৌথ সংগঠন হতে কেন্দ্রীয় যৌথ সংগঠন দলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবে না।

জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন বৈরিতার জন্য দলীয় সংগঠনে দুটি পাক-নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন নিয়া মূল নির্বাচনে অংশ নেওয়া অর্থাৎ সকল প্রকার রাজনৈতিক দলীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে আদর্শনীতি অনুসরণ করে সমমানের যৌথদলের সমন্বয় দেশের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সামাজিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে আসবে।

সম-মানের বৃহত্তর যৌথদলের আত্নপ্রকাশে অরাজনৈতিক দল, উপদল, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী দল এবং ছাত্র রাজনৈতিক প্রথা রহিত হবে এবং কোন প্রকার অস্থিত্ব থাকবে না। কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্য অস্থিত্ব নষ্ট হবে না। তাহার দলীয় কর্তৃত্ব তাহার নিজের দলেই থাকবে।

এক কথায় শুধু রাজনৈতিক কর্মপন্থায় জাতীয় নির্বাচন ও যৌথদলের নেতা-নেত্রীদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য অনুদান বা সালামী প্রদানে এবং দলীয় সংগঠন প্রথার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতার পরিবেষ এবং বার বার ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবণতা সংগঠন প্রথা প্রচলণে যৌথ দল ব্যবস্থার ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। রাজনীতিতে সাংগঠনিক অধিকার ফিরে আসবে। দেশ ও জনগণের মধ্যে

অংশীদারিত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিকার সংরক্ষণ হবে। সংগঠন প্রথা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হবে, সংগঠন প্রথার উত্তরণে সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হবে এবং নেতৃত্ব বিকাশে সংগঠন প্রথা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, জবাবদিহীতামূলক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জিবিত করা হবে। ধর্ম যার যার, উৎসব তাহার নিজের এবং রাজনীতিক সকলের জন্য সমঅধিকার। জাতী-ধর্ম-বর্ণ ও ছোট বড় সকল দল নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সর্বজন স্বীকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থবহ হবে। জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষমতা অর্জন হবে। বাক-স্বাধীনতা ও মতামতের অগ্রাধিকার দেওয়ার পথ সুগম হবে। প্রধানতঃ দেশ হতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হবে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ হবে।

বাক-স্বাধীনতা ও বিশ্বাস অগ্রাধিকার দেওয়া এবং জন জীবনে শান্তি ফিরে আসার বিষয় উত্তরণ রাজনীতিতে সংগঠন প্রথা প্রচলণ মূল ভূমিকা রাখবে। সংগঠন ব্যবস্থার জন্য তৃতীয় বিশ্বে একটি উন্নয়ণশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

সংগঠন প্রথা সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিভাজন প্রয়োজন।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক অধিকারে ৩০০টি সংসদীয় আসন নির্ধারিত ছিল, ইহার ৩০০টি এলাকাও নির্ধারিত। যাহার ধারাবাহিকতার অনুকূলে ৩০০ টি যৌথ দলীয় সংগঠন এলাকার প্রবর্তন। যাহার নামকরণ আঞ্চলিক সংগঠন এলাকা। এলাকাভিত্তিক বিষয় রূপান্তর সংখ্যা ৩০০টি সংগঠন এলাকা। পুনরায় ৩০০টির মধ্যে একটি আঞ্চলিক পরিষদকে বিভাজন তিনস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংগঠনের ক্ষমতাকে সমাজের দোরগোড়ায় তৃনমূলে পৌছানোর বা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে মূল্যায়ন।

০১। আঞ্চলিক সংগঠন এলাকা = ০১ টি (৩০০টির মধ্যে)
০২। বিভাগীয় সংগঠন এলাকা = ০৪ টি (৩০০X৪=১২০০টি)
০৩। নির্বাহী সংগঠন এলাকা = ১২ টি (৩০০X১২=৩৬০০টি)
০৪। তৃণমূল সংগঠন এলাকা = ৭২ টি (৩০০X৭২=২১৬০০টি)

উক্ত বিভাজন এলাকা প্রতিটি যৌথদলের জন্য নির্ধারিত। যাহার সংখ্যা সর্বমোট ২৬,৭০০টি। সকল সংগঠন এলাকার কর্তৃত্ব প্রধান যৌথদলের মধ্যে অর্পিত থাকবে। যৌথদল ও সংগঠন প্রথা বাস্তবায়নে জন মানুষের আস্থার প্রতিফলণ হবে, সম অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, জনগণের মধ্যে আর্থিক স্বক্ষমতা ফিরে আসবে, ফলে যৌথদলীয় অধিকারে যৌথ সংগঠন প্রথা বা পদ্ধতি বাস্তবায়নে জন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধারা-৫

প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঃ-

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার জনগণ আর জনগণের ভাগ্য নির্ধারনে সুশাসন ব্যবস্থা। আর এই সুবিশাল ব্যবস্থার প্রতিফলন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা বা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা। যেহেতু শাসন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কোন পদক্ষেপ না থাকিলে ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব বজায় থাকে না।

দ্বিতীয় কারণ হলো প্রশাসনিক আর দলীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা একত্রে চলতে পারে না। যাহা দুই মেরুর দুই প্রশাসন ব্যবস্থা। যাহা এক করে দেখার অবকাশ নেই। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বিষয়গুলি রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থে প্রতিফলিত হয়। যাহার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জনগণের স্বার্থের সম-অধিকার প্রশ্নে কোন মত পার্থক্যের অবকাশ নেই।

দলীয় সরকার জনগণের মানষিক বিকাশে কাজ করে কিন্তু জবাবদিহিতা প্রশ্নে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। সরকারে থাকিয়া দলের দলীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ তাহার নৈতিক দায়িত্বের বাহিরে। ইহাই আদর্শ নীতির বহি:প্রকাশ।

রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসনের মৌলিক অধিকার হারিয়ে ফেলে। ফলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, নীতিবোধ ও জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্রের অধিকার হারিয়ে যায়। এক সময় জনগণ আর দলীয় সরকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে না। আত্ম প্রত্যয় ও আত্ম প্রচেষ্টাই দেশের স্বনির্ভর ক্ষমতার প্রকৃত মূল মন্ত্র।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে সাংবিধানিক বা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি। আর তাহার ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু গণতন্ত্রের অধিকার রাজনৈতিক অনুশীলন ও রাজনৈতিক প্রথা বা পদ্ধতি প্রচলনে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার নেতৃত্ব দলীয় সরকারের হাতে চলে আসে ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সাংঘর্ষিক রাজনীতির বিদ্যমান হয়ে উঠে। ফলে শাসন ব্যবস্থায় মত পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় সরকারের ভাল মন্দের জবাবদিহিতা মূল্যায়ন হয় না। তাই ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় প্রতিফলন সাংবিধানিক অধিকার।

সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে শাসন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা বিকেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন। জনস্বার্থে জনগনের ক্ষমতার অংশিদারীত্ব বজায় থাকবে। জনগনের নিকট জবাবদিহিতার অধিকার সংরক্ষণ হবে। মূল কথা জনগণ তাহার অধিকার বলে রাষ্ট্রীয় ও নির্বাহী ক্ষমতার পট পরিবর্তনে সক্ষম হবে। সমালোচনার পথ পরিহার থাকবে। নির্ধারিত সময় কাহারো পক্ষে অভিযোগ থাকবে না। সঠিক সময়ে জনগণের জন স্বার্থ রক্ষায় তাহার মতের বহি:প্রকাশ প্রধান হাতিয়ার ভোটাধিকার।উক্ত ভোটাধিকার ব্যবহারের জন্য বর্তমান সংবিধান মতে ৫(পাঁচ) বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।

প্রশাসনিক স্বক্ষমতা বস্তুনিষ্ট প্রাণবন্ত করার লক্ষে জবাবদিহিতা মূল্যায়নে নির্বাহী প্রশাসন হতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ অংশ হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যাস্ত বা যুক্ত করার ফলে গণতান্ত্রিক অধিকারে রাজনৈতিক ধারার বিবর্তনে আইনের জটিলতা অনেকাংশে মূল্যহীন হবে। ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। জনমনে শান্তির সুবাতাস বয়ে যাবে। কারণ আমলাতন্ত্র জটিলতা হতে দেশ মুক্তি পাবে। প্রশাসনিক ও সংবিধানিক বিষয়ের মধ্যে (২) সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট অংশ) (৩) সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা (বিশ্ববিদ্যালয় অংশ) (৪) নির্বাচন কমিশন দপ্তর ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির দপ্তরে ন্যস্ত হলে দেশের সর্বোচ্চ তিনটি বিষয় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছাতার বহি:প্রকাশ প্রতিফলিত হবে। নির্বাহী বিভাগ দরয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা পরিচালিত হয় বিধায় দলীয় কোন না কোন মতামতের বিষয় থেকেই যায়। সর্ব ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ব্যবস্থার প্রতিফলণ হলেও নানা কারনে জনমনে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাই বিতর্কের জন্ম দেওয়ার উত্তর খুজতে নানা প্রকার জটিলতা চলে আসে। যাহার উত্তরণ সহজ করতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে কিছু কিছু বিষয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন হয়।

জনমানুষের স্বার্থ রক্ষা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় সরকার প্রধান উভয়ের কর্তব্যের এখতিয়ার। তাহারা কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন। তাহাদের দিক থেকে কোন প্রকার নির্দেশিত মনোভাব পোষণ হয় না, কিন্তু তাহারা সর্বদাই আন্তরিক। তবুও ভুলভ্রান্তির সুযোগ অনেক স্বার্থান্বেসী মহল নিয়ে থাকে। যাহা মোটেও কাম্য নয়। দলীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনের মধ্যে ভুল ভ্রান্তির দায়ভার সরকার প্রধানকেই নিত হয় বলে বিতর্ক এড়ানোর জন্য এবং তাহার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করা জন্য। যাহার বিষয় মতানৈক্য না থাকে এবং প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকার ও ভারসাম্য অক্ষুন্ন থাকে উক্ত বিষয় জনগণের স্বার্থ রক্ষার ক্ষমহতায় কিছু অংশ বিশেষ

আদেশ-নির্দেশ প্রতিফলণ হিসাবে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সরকার প্রধানের মর্যাদা অক্ষুন্ন হবে না। এবং তাহার কাজের সীমাবদ্ধতা উচ্চ শিহরে থাকবে। জনমানুষের স্বার্থ

ধারা-৬

যৌথদলীয় উন্নয়নে আর্থিক তহবিল ব্যবস্থা এবং সুষম বন্টন ঃ-

যৌথদলীয় দলগুলি সাংগঠনিক সংগঠন প্রথার মূল ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন। বাংলাদেশ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দেশ। বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর্থিক অভাব অনটনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ছোট বড় দলগুলি প্রায় দিশেহারা এবং পরনির্ভরশীলতায় ভুগছে। অর্থনৈতিক ভয়াবহতা নিরসনে প্রতিযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং যৌথদলীয় আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বচ্ছ পথে একে অপরের সহযোগিতা এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল জনগণকে আর্থিক সহযোগিতা আবশ্যক।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ তার সক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা। সফল প্রমাণে প্রতিফলণ এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদর্শনীতি। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে সফল, কিন্তু জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কিছুট হলেও ব্যর্থ। সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ও বেকারত্বের জন্য ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপদগ্রস্ত, যার প্রতিকার যৌথদলীয় সংগঠন ব্যবস্থা।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষে যৌথদলীয় রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন। যোগ্যতার মাপকাঠিতে সেতুবন্ধন সম-মানের সংগঠন প্রথা বাস্তবায়ন। বিশেষ করে নানা কারণে সমাজে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত। ক্ষমতার প্রভাব, সামাজিক ব্যাধি ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত।

বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ একটি আত্ন মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক অধিকার। পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার জন্য যৌথ দলীয় সংগঠন প্রথা যুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা। অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের জ্ঞানশক্তি বা দৈহিক সামাজিক জীবন পরিচালনাই হচ্ছে স্বনির্ভরতা।

শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য নি:সন্দেহে আমাদের সমাজের চাহিদার আলোকে আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার অন্যতম শর্ত হলো দুর্নীতিরোধ করা। আর এই দুর্নীতি নিরসনে যৌথদল এবং দলীয় সংগঠন প্রথার অপরিহার্য। কারণ রাজনৈতিক সকল দলকে সমমানের দল প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ সংগঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল গণতান্ত্রিক পথ।

যৌথদলের সমন্বয় সংগঠন এলাকায় অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য যৌথ সংগঠন অংশীদারিত্ব বজায় রাখা, যেমন-মূলধন গঠনে যৌথদলীয় প্রতিযোগিতা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা, সকলের অংশগ্রহণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, পরনির্ভরশীলতার অবসান ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন সম্ভব হবে যৌথদলীয় সংগঠনের কর্মযজ্ঞে।

যৌথদলের অর্থনৈতিক বিকাশে আর্থিক স্বনির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রথম পদক্ষেপ, যেমন-সামাজিক অধিকারে যৌথদলকে শক্তিশালী করার লক্ষে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সকলের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক যৌথ সংগঠনকে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যেক যৌথদলের নেতা-নেত্রীকে আর্থিক সাবলম্বী করা বিশেষ প্রয়োজন-কারণ প্রত্যেক যৌথদলের নেতা-নেত্রীর আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে দেশ হতে দুর্নীতি, অপনীতি, আধিপত্য বিস্তার এবং অনৈতিক কর্মকান্ডের অবসান হবে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ক্ষেত্র বিনষ্ট হবে।

যৌথ সংগঠন দলের আর্থিক আহরণ বিষয় বিভিন্ন পথে হতে পারে। যার ব্যবস্থায় যৌথদলের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাগণের সমর্থন অনুযায়ী চাঁদা ও অনুদান প্রদানে ইচ্ছা পোষণ করা তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। যা যৌথদলীয় মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

দফা-১, আর্থিক আহরণ বিষয় ব্যবস্থা ঃ-

(০১) রাজনৈতিকভাবে যৌথদলের সদস্য আহরণ নিবন্ধন ফি এবং প্রবাসী সদস্য আহরণ নিবন্ধন ফি।

(০২) প্রত্যেক যৌথদলীয় নিবন্ধন সদস্যদের মাসিক চাঁদা ।

(০৩) সমর্থনযোগ্য সদস্যদের বাৎসরিক অনুদান।

(০৪) রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রত্যেক যৌথদলের জন্য সমসমান প্রযোজ্য।

(০৫) যৌথদলীয় (সুদমুক্ত) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন। উক্ত ঋণ ব্যবস্থার মুনাফা হতে অর্থ সুবিধা।

(০৬) যৌথদলীয় পরিচালনায় মধ্য শ্রেণি, অর্থলগ্নী ব্যবস্থা দেশের উন্নয়নে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি হতে অর্থ আহরণ।

(০৭) **১:১, যৌথদলীয় বাৎসরিক আয় ব্যবস্থার উৎস ।**

উদাহরণ-১ঃ

ছক চিত্র-১		
১) দেশের বর্তমান লোকসংখ্যা	--- --- ---	**১৮৪৫.০০ লক্ষ**
২) মোট ভোটার সংখ্যা	--- --- ---	**১৩০৮.০০লক্ষ**
৩) সনদপ্রাপ্ত দলীয় ভোটার ও প্রবাসী ভোটার সংখ্যা	--- --- ---	১০৬৬.০০ লক্ষ
০১) সনদপ্রাপ্ত দলীয় ভোটার	--- --- ---	৯৯৬.০০ লক্ষ
০২) সনদপ্রাপ্ত প্রবাসী ভোটার	--- --- ---	৭০.০০ লক্ষ
৪) নি:র্দলীয় সনদপ্রাপ্ত ভোটার সংখ্যা	--- --- ---	১৪২.০০ লক্ষ
৫) প্রশাসনিক ভোটার সংখ্যা	--- --- ---	৫৫.০০ লক্ষ
নতুন ভোটার (১৮ বৎসর ২২ বৎসর পর্যন্ত)	--- --- ---	৪৫.০০ লক্ষ
	সর্বমোট ভোটার =	**১৩০৮.০০ লক্ষ**
৬) **আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল সংখ্যা=৩০০টি**		
৭) **১টি আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল মোট ভোটার সংখ্যা**	১৩০৮.০০ লক্ষ/ ৩০০ =	**৪.৩৬০০০জন**
৮) ১টি আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল দলীয় ভোটার সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত) =	১০৬৬.০০ লক্ষ/ ৩০০ =	৩,৫৫,৩৩৩ জন
০১) নি:র্দলীয় ভোটার সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত)	১৪২.০০ লক্ষ/ ৩০০ =	৪৭,৩৩৩ জন
০১) প্রশাসনিক ভোটার সংখ্যা	৫৫.০০ লক্ষ/ ৩০০ =	১৮,৩৩৪ জন
০২) নতুন ভোটার (১৮ বৎসর ২২ বৎসর পর্যন্ত)=	৪৫.০০ লক্ষ/ ৩০০ =	১৫,০০০ জন
	সর্বমোট ভোটার =	**৪,৩৬,০০০ জন**

ছক চিত্র-১ ঃ ২		
১ঃ২) চাঁদা দাতার যোগ্য ব্যক্তি ঃ		
১) যৌথদলীয় সদস্য সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত)----	--- --- ---	৯৯৬.০০ লক্ষ
২) প্রবাসী সদস্য সংখ্যা (সনদপ্রাপ্ত)	--- --- ---	৭০.০০ লক্ষ
	মোট সংখ্যা =	১০৬৬.০০লক্ষ
৩) নি:র্দলীয় সদস্য সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত)	--- --- ---	১৪২.০০ লক্ষ
	মোট চাঁদা দাতা সংখ্যা =	১২০৮.০০ লক্ষ
১ঃ৩) আঞ্চলিক যৌথ সংগঠন অঞ্চল=৩০০টি, যৌথ সংগঠন দল=৬টি		
) ১টি আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল সদস্য সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত)	৯৯৬/৬/৩০০ =	৫৫,৩৩৩ জন
২) প্রবাসী সদস্য সংখ্যা (সনদ প্রাপ্ত)	০.৫৪/৬/৩০০=	৩,০০০ জন।
৩)সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা=	(অর্থাৎ ১০% কম)	৫০,০০০ জন।
৪)সর্বনিম্ন প্রবাসী সদস্য সংখ্যা=	=(অর্থাৎ ১০% কম)=	২,৭০০ জন।

দফা - ২) যৌথদলীয় সদস্য বাৎসরিক আয় (আহরণ)।

ছক চিত্র-২

২:১. আঞ্চলিক যৌথ সংগঠন অঞ্চল=১টি।							
২:২. চাঁদা ও অনুদান আহরণ ব্যবস্থা।							
২:৩. সদস্য সংখ্যা=(৫০,০০০+২৭০০ সর্বনিম্ন নির্ধারিত)							
২:৪ বিষয়ঃ- যৌথ দলীয় ভর্তি ফি বাবদ।							
ক্রমিক নং	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা হাজার	চাঁদা হার প্রতি	মোট চাঁদা (লক্ষ)	বাৎসরিক চাঁদা (লক্ষ)	বাজেট (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২:৪:১	নিম্নবিত্ত সদস্য	২০	৫০	১০.০০	১০.০০		
২:৪:২	সাধারণ সদস্য	১৫	১০০	১৫.০০	১৫.০০		
২:৪:৩	মধ্যবিত্ত সদস্য	১০	২০০	২০.০০	২০.০০		
২:৪:৪	উচ্চবিত্ত সদস্য	৫	৩০০	১৫.০০	১৫.০০		
২:৪:৫	প্রবাসী সদস্য	২,৭০০	২০০	৫.৪০	৫.৪০		
					মোট বাজেট	৬৫.৪০	

২:৫ - (যৌথ দলীয় ১২ মাসের চাঁদা) (আঞ্চলিক যৌথ সংগঠন অঞ্চল=১টি)

ছক চিত্র-২ ঃ ১

ক্রমিক নং	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা হাজার	চাঁদাহার প্রতি	মোট চাঁদা (লক্ষ টাকায়)	বাৎসরিক চাঁদা (লক্ষ টাকায়)	বাজেট (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২:৫:১	নিম্নবিত্ত সদস্য	২০	৫০	১০.০০	১২০.০০		
২:৫:২	সাধারণ সদস্য	১৫	১০০	১৫.০০	১৮০.০০		
২:৫:৩	মধ্যবিত্ত সদস্য	১০	২০০	২০.০০	২৪০.০০		
২:৫:৪	উচ্চবিত্ত সদস্য	৫	৩০০	১৫.০০	১৮০.০০		
২:৫:৫	প্রবাসী সদস্য	২৭০০	২০০	৫.৪০	৬৪.৮০		
					সর্বমোট টাকা	৭৮৪.৮০	

২:৬, (যৌথ দলীয় বাৎসরিক অনুদান) (আঞ্চলিক যৌথ সংগঠন অঞ্চল=১টি)

ছক চিত্র-২ ঃ ২

ক্রমিক নং	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা (হাজার)	অনুদান প্রতি জন (হাজার)	মোট অনুদান (লক্ষ টাকায়)	সর্বমোট বাৎসরিক অনুদান (লক্ষ টাকায়)	বাজেট (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২:৬:১	সাধারন সদস্য সংখ্যা	১০	২	০০.০০	২০০.০০		**<u>সরকারি অনুদানঃ</u>** ১টি যৌথ দলীয় সংগঠনের ৩০০টি সংগঠন অঞ্চলের অনুদান হিসাব (১টি আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চলের জন্য (৭০০.০০ লক্ষ)।
২:৬:২	উচ্চ শ্রেণি সদস্য	৫	৫	২৫০.০০	২৫০.০০		
২:৬:৩	প্রবাসী সদস্য	১	৫	৫০.০০	৫০.০০		
২:৬:৪	রাষ্ট্রীয় অনুদান	২১০০.০০ লক্ষ /৩০০	৭০০.০০ লক্ষ	৭০০.০০	৭০০.০০		
					সর্বমোট টাকা	১২০০.০০	

২:৭, (যৌথদলীয় ঋণ প্রদান ব্যবস্থা) (আঞ্চলিক যৌথ সংগঠন অঞ্চল=১টি)

ছক চিত্র-২ ঃ ৩

ক্রমিক নং	বিবরণ	লগ্নী সংখ্যা প্রতিটি	মুনাফার হার	মোট মূলধন (লক্ষ টাকায়)	মাসিক মুনাফা (লক্ষ টাকায়)	সর্বমোট মুনাফা বাৎসরিক (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২:৭:১	ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা	২:৫ (অ.)	৩%	৪২০.০০	১২.৬০	১৩৮.৬০	১১ মাসের জন্য ক্রমিক নং ২:৫:২ ও ২:৫:৩।

২:৭:২	সাধারণ ঋণ	২:৫(অ.)	৪%	৩৮৪.৮০	১৪.৬৯	৪৩.১৬	
২:৭:৩	উচ্চ ঋণ ব্যবস্থা	২:৬(অ.)	৫%	২০০.০০	১০.০০	১৫৪.০০	ক্র: নং ২:৬:১
২:৭:৪	ঋণপত্র-১ (বিক্রয় ব্যবস্থা)	১৪০০	লগ্নী টাকা একক সংখ্যা ৫০ হাজার	৭০০.০০	---	৭০০.০০	মূলধন ও (মুনাফা আঞ্চলিক অঞ্চল) ক্রমিক নং ২:৪:৬
২:৭:৫	ঋণপত্র-২ (বিক্রয় ব্যবস্থা)	২০৮৪	লগ্নী টাকা একক সংখ্যা ১২ হাজার	২৫০.০০	৬০০.০০ প্রতি কিস্তি হিসাবে	১২৯.০০ (মূলধন বাদে)	৬০০ টাকা হিসাবে ২৫ কিস্তিতে পরিশোধ, বৎসরে দুইবার বিতরণ যোগ্য)
২:৭:৬	ঋণপত্র-৩ বিক্রয় ব্যবস্থা	২৩০৮	লগ্নী টাকা একক সংখ্যা ৫ হাজার	৬৫.৪০+ ৫০.০০ =১১৫.৪০	(১০০/-x ৩৬০ দিনের জন্য)	৭১৫.৪৮ মূলধন বাদ	ক্রমিক নং ২:৪ ক্রমিক নং ২:৬:৩ মূলধন অফেরতযোগ্য
সর্বমোট মুনাফার টাকা=১৯৫০.৫৯							
(ক্রমিক নং ২:৪, ২:৫, ২:৬ ও ২:৭) আহরণকৃত = ৪০০০.৭৯ লক্ষ টাকা=৪০.০০ কোটি।							

পরিশিষ্ট-২ঃ ব্যয় হিসাবে সকল উদাহরণের সপক্ষে দুইটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত,

প্রদত্ত উদাহরণ-১

ছক-চিত্র-৩

যৌথদলীয় বাৎসরিক ব্যয় হিসাব নির্ধারণ ঃ

৩:১ তৃণমূল সংগঠন অঞ্চল।

৩:২ তৃণমূল অঞ্চল সংখ্যা = ৭২টি

৩:৩ বিষয়ঃ বেতন-ভাতা/সালামী।

৩:৪ তৃণমূল অঞ্চল সংখ্যা=১টি

ক্রমিক নং	বিবরণ	যৌথ দলীয় সংখ্যা	মাসিক বেতন-ভাতা	মোট বেতন-ভাতা	বাৎসরিক ব্যয় (লক্ষ)	বাজেট (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩:৪:১	**পরিচালনা পর্ষদ**						
৩:৪:১:১	সভাপতি	১	০.৪৫	০.৪০	৫.৪০		
৩:৪:১:২	সম্পাদক	১	০.৪০	০.৪০	৪.৮০	১০.২০	
৩:৪:২	**প্রশাসনিক দপ্তর**						
৩:৪:২:১	সচিব	১	০.৩৫	০.৩৫	৪.২০		
৩:৪:২:২	কর্মচারী	২	০.৩০	০.৬০	৭.২০		
৩:৪:২:৩	পিয়ন	১	০.১৫	০.১৫	১.৮০		
৩:৪:২:৪	গার্ড	১	০.১৫	০.১৫	১.৮০	১৫.০০	
					মোট ব্যয় হিসাব	২৫.২০	

ক্রমিক নং- **৩:৫,** (বিষয়ঃ বিবিধ খরচ)

ছক চিত্র-৩:১

ক্রমিক নং	বিবরণ	যৌথ দলীয় সংখ্যা	মাসিক বেতন-ভাতা	মোট বেতন-ভাতা (লক্ষ)	বাৎসরিক ব্যয় (লক্ষ)	বাজেট (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩:৫:০১	অফিস ভাড়া	১	০.১০	০.১০	১.২০		

৩:৫:০২	বিদ্যুৎ বিল	১	০.০২	০.০২	০.২৪		
৩:৫:০৩	নির্বাচন ব্যয়	১	০.১০	০.১০	১.২০		
৩:৫:০৪	আনুষঙ্গিক খরচ	১	০.০৫	০.০৫	০.৬০		
				মোট খরচ	৩.২৪	৩.২৪	
				(৪:১+৪:২+৪:৩) মোট ব্যয়		২৮.৪৪	
(৩:৪+৩:৫ মূল্যায়ন) তৃণমূল অঞ্চল সংখ্যা ৭২টি=(৭২x২৮.৪৪)=২০৪৭.৬৮							

প্রদত্ত উদাহরণ-২

৪. যৌথ দলীয় বাৎসরিক ব্যয় হিসাব ঃ

৪:১ নির্বাহী সংগঠন অঞ্চল

৪:২ নির্বাহী অঞ্চল সংখ্যা=১২টি

৪:৩ বিষয়ঃ বেতন-ভাতা/সালামী

৪:৪ নির্বাহী অঞ্চল সংখ্যা= ১টির জন্য প্রযোজ্য)

ছক চিত্র-৩

ক্রমিক নং	বিবরণ	যৌথ দলীয় সংখ্যা	মাসিক বেতন-ভাতা (লক্ষ)	মোট বেতন-ভাতা	বাৎসরিক ব্যয় (লক্ষ)	বাজেট (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪:৪:১	**পরিচালনা পর্ষদ**						
৪:৪:১:১	সভাপতি	১	০.৬০	০.৬০	৭.২০		
৪:৪:১:২	সম্পাদক	১	০.৫০	০.৫০	৬.০০		
৪:৪:২	**প্রশাসনিক কর্মচারী সংখ্যা**						
৪:৪:২:১	সচিব	১	০.৪৫	০.৪৫	৫.৪০		
৪:৪:২:২	কর্মচারী	২	০.৩৫	০.৭০	৮.৪৭০		
৪:৪:২:৩	টেকনিশিয়ান	১	০.৩৫	০.৩৫	৪.২০		
৪:৪:২:৪	পিয়ন	২	০.১৮	০.৩৫	৪.৩২		
৪:৪:২:৫	গার্ড	১	০.১৮	০.১৮	২.১৬		
					সর্বমোট খরচ (বেতন-ভাতা বাবদ)	৩৭.৬৮	

ক্রমিক নং-**৪:৫**(নির্বাহী অঞ্চল সংখ্যা= **১**টি) বিষয়ঃ বিবিধ খরচ

ছক চিত্র-৩:১

ক্রমিক নং	বিবরণ	যৌথ দলীয় সংখ্যা	মাসিক বেতন-ভাতা	মোট বেতন-ভাতা	বাৎসরিক ব্যয় (লক্ষ)	বাজেট (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫		৭	৮
৪:৫:০১	অফিস ভাড়া	১	০.১৫	০.১৫	১.৮০		
৪:৫:০২	বিদ্যুৎ বিল	১	০.০৫	০.০৫	০.৬০		
৪:৫:০৩	নির্বাচন ব্যয়	১	০.৫০	০.৫০	৬.০০		
৪:৫:০৪	আনুষঙ্গিক খরচ	১	০.১০	০.১০	১.২০		
				মোট খরচ	৯.৬০	৯.৬০	
					মোট খরচ (৪:৪+৪:৫)=	৪৭.২৮	
(৪:৪ ও ৪:৫ মূল্যায়ন) নির্বাহী অঞ্চল সংখ্যা ১২টি= (১২ x ৪৭.২৮) =৫৬৭.৩৬							

ব্যয় হিসাবে উদাহরণ-১ ও ২ সহ ক্রমিক নং ৩-৯ পর্যন্ত নিম্নে প্রদত্ত,
(৩) বিভাগীয় সংগঠন অঞ্চল ব্যয় ২৬৫.৭৬ (ব্যয় ক্রমিক নং-৫),
(৪) আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল ব্যয় ১৯৪.৬০(ব্যয় ক্রমিক নং-৬) এবং
(৫) প্রধান সংগঠন যৌথদল ব্যয় ৫৮৫.০০ (ব্যয় ক্রমিক নং-৭)।

তা ছাড়া প্রধান দলের অধীন যে সকল সংস্থা সংযুক্ত,
৬) প্রধান নির্বাচন বিভাগীয় ব্যয় ১৫৩.৪৮ (ব্যয় ক্রমিক নং-০৮),
৭) নির্বাচন উপ-কমিটি সংখ্যা=৫টি ব্যয় ২৫৫.৬০ (ব্যয় ক্রমিক নং-৯),
৮) হিসাব রক্ষক ব্যয় ১৫২.২৮ (ব্যয় ক্রমিক নং-১০) এবং
৯) হিসাব রক্ষক উপ-কমিটি ৫টি (অডিট), যার ব্যয় ২৪০.৬০ (ব্যয় ক্রমিক নং-১১)।

সর্বমোট ব্যয় = ৩৮.৯৪ লক্ষ টাকা, যার তথ্যাদি মূল বই **"রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্র"** এ উল্লেখিত। সকল চালিকা শক্তির উৎস সম-মানের বৃহত্তর যৌথদল সম-অধিকারে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনে উন্নততর শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষে অংশীদারিত্ব বজায় রাখার মূল চালিকা শক্তি মাত্র। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাথায় রেখে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বন্ধনে সম-মানের দলীয় সদস্য বেষ্টিত ৬টি যৌথদলের বাৎসরিক আয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যার উদাহরণ ৩টি নিম্নে প্রদত্ত।

পরিশিষ্ট-৩ প্রেক্ষাপটে যৌথদলীয় আর্থিক আয় পরিসংখ্যান।

উদাহরণ-১

ঋণপত্র ঃ-১ (২:৭:৪)

ঋণপত্র বিক্রয় ব্যবস্থা মোতাবেক মূলধন ৭০০.০০ লক্ষ টাকা সুদ মুক্ত ঋণ ব্যবস্থা গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন খেটে খাওয়া জন মানুষের মধ্যে বিতরণ ব্যবস্থায় ৫০ হাজার টাকা নির্ধারিত। যার মধ্যে ৩০ হাজার টাকায় একটি গরুর বাছুর ক্রয় সাপেক্ষে এক একটি পরিবারের জন্য ৩-৫টি পর্যন্ত নির্ধারণ ব্যবস্থা নির্ধারিত থাকবে। উক্ত পরিকল্পনায় ১৪০০টি গরুর বাছুরে একটি যৌথদলের জন্য একটি আঞ্চলিক অঞ্চলের মধ্যে সুষম বন্টন ব্যবস্থার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটি এবং লালন পালন ব্যবস্থা তদারিক করার জন্য ৫ সদস্য কমিটি নির্ধারণে কমপক্ষে দুই ধাপে ৭০টি অর্থাৎ ১৪০টি কমিটির ব্যবস্থা থাকিবে।

যার আয়-ব্যয় হিসাব ঃ একটি যৌথদল ও ১টি আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল এলাকায় ১৪০০টির মধ্যে একটি গরুর বাছুর ক্রয় মূল্য ৩৫ হাজার টাকা হিসাবে ৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং লালন পালন ব্যবস্থায় ১৪০০টি গরুর জন্য ১৫ হাজার মোট ২১০ লক্ষ সর্বমোট ৭০০.০০ লক্ষ টাকার প্রোগ্রাম থাকিবে। উল্লেখ্য যে, গরুগুলি ১১ মাস লালন পালনের পর কোরবানী ঈদের সময় ৫ সদস্য কমিটির মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া মূলধন বাদে অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা বা কম হতে পারে এবং বেশী হলেও ৫০ হাজার বাকী টাকার অতিরিক্ত মূল্য পাওয়া গেলে লালন পালনকারীর জন্য বরাদ্দ থাকিবে।

উক্ত প্যাকেজ প্রদানে ৭০০.০০ লক্ষ টাকার মূলধন ফেরত বাদে অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ বাদে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসরের জন্য মুনাফা হতে পারে। উহা যৌথদলের আর্থিক খাতে ব্যয় হবে। আর পালনকারীরা পেয়ে যাবেন ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অতিরিক্ত বিক্রয় মূল্য। প্রত্যেকের ভাগ্যে হয়তো ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১টির জন্য হতে পারে। যদি ৩টির জন্য ১,৮০,০০০/- আর ৫টির জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা আয় হতে পারে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বন্ধনে সম-মানের দলীয় সদস্য বেষ্টিত যৌথদলের সংখ্যা বিবেচনা করা হয় আঞ্চলিক এলাকার (সনদপ্রাপ্ত) ভোটার সংখ্যা ৪.৩৬ লক্ষ এবং সাংগঠনিক অঞ্চল সংখ্যা ৩০০টি।

উদাহরণ-২,
ঋণপত্র-২ (ক্রমিক নং ২:৭:৫)

একটি যৌথদলের আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ঋণ ব্যবস্থা। ঋণপত্র বিক্রয় ব্যবস্থার মূলধন ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২১৫০টি ঋণপত্র দ্বারা প্রতিটি ১২ হাজার টাকা হিসাবে শহরে-গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি ছোট খাট ব্যবসায়িকে ব্যবসার জন্য মূলধন দেওয়া হবে। তাহাকে মূলধন ফেরত দেয়া সাপেক্ষে ২৫ কিস্তিতে ৬০০/- টাকা কিস্তি প্রদান করতঃ পরিশোধযোগ্য বৎসরে দুইবার মূলধন দেওয়া হবে। ফলে ৫ মাসে ১৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মূলধন বাদে ৩,০০০/- টাকা মুনাফা ধরা যেতে পারে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে মূলধন একসাথে ফেরত দেওয়ার অবকাশ নাই বিধায় তাহার উপর বাড়তি চাপ পরবে না।

উক্ত ব্যবস্থায় বৎসরে ২ বার অর্থলগ্নী করা যাবে। যাহার ব্যবস্থা শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য প্রযোজ্য। একজন গ্রাহকের জন্য মালামাল পরিবহনে ভ্যানগাড়ী ক্রয় এবং মালামাল ক্রয় সাপেক্ষে ঋণ প্রদান হবে। যাহার জন্য ৫ সদস্য কমিটি থাকিবে, যদি কোন গ্রাহক সঠিকভাবে ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন তৃতীয়বারের জন্য কিস্তির ক্ষেত্রে ২০% হইতে ৩০% মুনাফার অংশ ফেরত দেওয়া হবে। উক্ত ব্যবস্থা (২০৮৪x৬x৩০০) = ৩৭.৫১ লক্ষ টাকা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে। বৎসরে দুইবার সাহায্য সহযোগিতার ফলে একজন গ্রাহক দিন শেষে ১টি মাটির ব্যাংক মাধ্যমে ১০০/- টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

সপ্তাহ শেষে ৭০০/- টাকা হতে ৬০০/- টাকার কিস্তি দেওয়ার পর ১০০/- টাকা তাহার নিজ জমা হইবে বৎসর ৪,৮০০/- টাকা সেই সাথে দলীয় রেয়াত যোগ হলে ২,৪০০/- টাকা এবং উক্ত টাকা ডাক বিভাগ ব্যাংক হিসাবে স্থায়ী জমা রাখতে হবে যাহা ২০ বৎসরের জন্য নির্ধারিত। উক্ত টাকা জমার সাথে সরকারি অনুদান হিসাবে ১০০% যোগ হইবে। ফলে ২০ বৎসরে ১৪,৪০০x২০)= ২,৮৮,০০০/- টাকা তাহার স্থায়ী মূলধন দাঁড়াবে। তাহার ভাগ্য পরিবর্তন সহায়ক হবে।

তাহার মূলধন স্থায়ী জামানত হিসাবে জমা হবে তাহার বিপদ আপদে সাহায্য হবে। উক্ত টাকারও ঋণ ব্যবস্থা কিন্তু তাহাকে যৌথদলের দলীয় সদস্য সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। তাহার প্রয়োজন হবে জাতীয় পরিচয় পত্র, ভোটার হওয়ার যোগ্যতা এবং দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির জামানত সাক্ষী।

বিশেষ করে কিস্তির টাকা ডাক বিভাগ সঞ্চয়ী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন। প্রতিটি কিস্তি ৬০০/- টাকা হিসাবে জমার পর শেষের কিস্তিতে ১,০০০/- টাকার চেক প্রদান করতে হবে। ইহার মধ্যে মাসে ৪০০/- টাকা তাহার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে যাবে। উক্ত পদ্ধতিতে প্রত্যেককে গ্রাহক সাবলম্বি করার ব্যবস্থা থাকবে।

উদাহরণ-৩,

ঋণপত্র-৩ বিক্রয় ব্যবস্থা (ক্রমিক নং ২:৭:৬)

একটি যৌথ দলীয় প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। ঋণপত্র বিক্রয় ব্যবস্থা। ঋণপত্র বিক্রয় ব্যবস্থায় মূলধন (ক্রমিক নং ২:৪ এবং ২:৬:৩) মোট ৬৫.৪০ + ৫০.০০ লক্ষ = ১১৫.৪০ লক্ষ টাকা। ইহার বন্টন ব্যবস্থায় ২৩০৮ জন সদস্য সনদপ্রাপ্ত এবং সনদবিহীন জনমানুষ অংশ গ্রহণ করিতে নির্ধারিত ব্যক্তি। উক্ত ব্যবস্থা দৈনিক প্রদান ব্যবস্থা ১০০/- টাকা অর্থাৎ স্থায়ী ঠিকানা, সাধারণ ঠিকানা এবং মটর বাহন জরুরী যান চলাচলের জন্য ইজিবাইক এমনকি টেম্পু ইত্যাদি উক্ত ঋণ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত। প্রতিটি সদস্যকে ৫,০০০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং রাস্তায় চলাচলের জন্য যৌথদলীয় প্রতিষ্ঠানের যৌথদলীয় সংগঠন আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চলের। ৭২টি তৃণমূল অঞ্চল হতে রাস্তায় চলাচলের জন্য সনদ ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে শহরে বা শহরের আশে পাশে যৌথদলীয় আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এমনকি উপজেলা শহরেও ইহার ব্যবস্থা থাকবে। উক্ত ব্যবস্থায় সারাদেশে ২৫.৯২ লক্ষ যানবাহন ব্যবস্থা থাকবে (৩০০x৬x৭২x২০)টি সনদপ্রাপ্ত যান)। বিশেষ করে ঢাকা রাজধানী শহরের জন্য (২০x৬x৭২x৫০)=৪.৩২ ইজিবাইক, সিএনজি, অটো ব্যাটারী রিকশা, মটর বাইক ইত্যাদি ব্যবস্থায় সর্বস্বার্থে চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। ইহার ব্যবস্থা যৌথদলীয় প্রতিষ্ঠায় ঋণ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত মালিকানা ইহার ফলে প্রত্যেক যাববাহনে ৫,০০০/- টাকা ও রোড পারমিট ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিবে। উক্ত যানবাহণগুলি চলাচলের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়া নিবন্ধন থাকবে। যাহার চলাচলে কোন বাধার সম্মুখীণ হবে না।

বিশেষ করে সকল শহরগুলির উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। বিশেষ করে উক্ত ব্যবস্থা যানজট নিরসনের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি যানবাহণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকবল ব্যবস্থায় থাকবে যৌথদলীয় সংগঠন। কিন্তু প্রত্যেকের সদস্য পদ থাকতে হবে তাহার অবস্থান এলাকায়। উক্ত যানবাহনের জন্য ভাড়া নির্ধারিত থাকবে।

বিভাজন হিসাবে ঃ ঋণ ব্যবস্থার আওতায় যানবাহনের রাজধানীর আশে পাশের আঞ্চলিক সংগঠন অঞ্চল সংখ্যা ২০টি, (যাহার সংসদীয় আসন ২০টির সমান), যৌথদলীয় সংখ্যা ৬টি, তৃণমূল সংগঠন সংখ্যা ৭২টি। যাহার বিভাজন যানবাহণ নামসহ ভাড়া নির্ধারণ ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত ঃ-

১। মটর বাইক সংখ্যা (২০x৬x৭২x৮=৬৯১২০টি) প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২০ টাকা নির্ধারিত।

২। সিএনজি সংখ্যা (২০x৬x৭২x৮=৬৯১২০টি) প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২০ টাকা নির্ধারিত৩। অটো রিকশা সংখ্যা (২০x৬x৭২x৮=৬৯১২০টি) প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২০ টাকা নির্ধারিত। ৪। ইজিবাইক সংখ্যা (২০x৬x৭২x৮=৬৯১২০টি) প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২০ টাকা নির্ধারিত।

৫। সাধারণ রিকশা সংখ্যা(২০x৬x৭২x৮=৬৯১২০টি) প্রতিকিলোমিটার ভাড়া ২০ টাকা নির্ধারিত।

বিশেষ করে একটি যৌথদলের অধিন তৃণমূল সংগঠন অঞ্চলের জন্য ৪০টি (৫ প্রকারের যানবাহন) চলাচলের অনুমতি প্রাপ্ত হবে।

অর্থনৈতিক আর্থিক স্বচ্ছলতার আহরণকৃত টাকা ৬টি বিভিন্ন যৌথদলীয় সংগঠন বিভাজনের ভিত্তিতে ব্যয়ের ধারা প্রবর্তনে সম-অধিকার বজায় থাকবে এবং যাহার ফলে অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা সমাজের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে। তাছাড়া অন্যান্য উদাহরণ তথ্যাদি মূল বই "রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরণে গণতন্ত্র" দ্রষ্টব্য।

ধারা-৮

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ও দলীয় নির্বাচনের প্রবর্তন ঃ-

নির্বাচন পরিভাষা বলতে যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা শুধু রাজনৈতিক ও দেশের শাসন ব্যবস্থার নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্র তৈরী করার কারখানা। ইহার প্রতিফলণ নিরপেক্ষতা অর্জন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হয়ে থাকে। ইহার নাম নির্বাচন কমিশন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি একটি সাংবিধানিক নিরপেক্ষ জনমানুষের বিতর্কের উর্দ্ধে থাকা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী আসনটির নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে থাকে। যাহার ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রের উর্দ্ধে থাকতে হবে এবং এখানে আদেশ নির্দেশের প্রয়োজন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া বলে প্রতীয়মান। তাই রাষ্ট্রপতি হলো সকল ক্ষম

তার অধিকারী। তাই নির্বাচন কমিশনের কর্ণধার হিসাবে আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে মাননীয় রাষ্ট্রপতির বিষয়। আর কমিশন শুধু রাষ্ট্রপতির আদেশ নির্দেশ পালনে ও বাস্তবায়নে সক্ষম প্রতিষ্ঠান প্রশাসন। বিশেষ করে উক্ত কমিশনের নিজস্ব কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের বিষয় ক্ষমতা নেই। এই কমিশন শুধু কয়েকটি কাজে অর্থাৎ নির্বাচন বিষয় কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই কমিশন কোন দলের বা ব্যক্তির বিষয়ে কোন প্রকার মতামত ব্যক্তয় বিষয় নিষিদ্ধ। যাহার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির জন্মগত অধিকার জনমানুষের জন্য, যেমন-

(১) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, (২) ভোটার তালিকা প্রণয়ন, (৩) নির্বাচন এলাকার সীমানা নির্ণয় এবং

(৪) নির্বাচন প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে শুধু সাংবিধানিক পদের বিপরীতে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোন রাজনৈতিক দলীয় নির্বাচনে কোন প্রকার সহযোগিতা থাকবে না। কিন্তু যদি কোন রাজনৈতিক দল তাহাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় লোকবল প্রয়োজন হয় অনুরোধক্রমে সরবরাহ করতে বাধ্য। এই প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল নেতৃত্ব নির্বাচন একবার অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন,

দেশের বর্তমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে- ১ নং দফার প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করিবেন।

(০১) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতি রূপে কার্য করিবেন।

(০২) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদে মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল হইবে এবং

ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(০৩) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালরে ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কমিশনার যাহার সংখ্যা ৪ জন তাহাদের নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার। রাষ্ট্রপতি সকল যৌথ দলের মতামতের আলোকে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন জনের নাম সংগ্রহ করতে পারিবেন। তাহারা হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে কোন সময়ের অবসরপ্রাপ্ত। অন্যান্য কমিশনারদের জন্য উক্ত বিচারপতি এবং উচ্চ শিক্ষিত সমাজকর্মী হতে পারে। সকল নাম একত্র করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লটারীর মাধ্যমে সকলের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিয়া নির্বাচিত করিবেন রাষ্ট্রপতির দপ্তর। বিগত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই পদে নির্দিষ্ট কিন্তু কমিশনারগণ অংশ নিতে পারিবেন। এই কমিশনের সময়কাল ৪ বৎসর, প্রতি ৪ বৎসর পর পর এই কমিশন নির্বাচিত হবে।

<u>নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য পালনে সীমাবদ্ধতা</u> ঃ-

(০১) ১৮ বৎসর পূর্ণ নাগরিকের জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(০২) নির্বাচন পূর্বক ভোটার তালিকা প্রণয়ন।

(০৩) সংসদ সদস্য নির্বাচন অর্থাৎ জাতীয় সাধারন নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা)।

(০৪) প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ভোটার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কাজ করা।

(০৫) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন এবং সংসদীয় স্পীকার নির্বাচনে সহযোগিতা এবং লোকবলের ব্যবস্থা করণ।

উপরোক্ত ৫টি দফার বাহিরে কোন রাষ্ট্রীয় কাজে বা দলের দলীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

সংসদীয় ও যৌথ সংগঠন দলের সীমানা নির্ধারণ ব্যবস্থা-

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং যৌথ দলীয় সংগঠন দলের এলাকার সীমানা নির্ধারন ব্যবস্থা কমিশনের এখতিয়ার। উল্লেখ্য যে, যৌথ দলীয় সংগঠনের কোন নিবন্ধন প্রয়োজন নেই উক্ত সংগঠনগুলি সাংগঠনিক অধিকারে সাংবিধানিক। তাহাদের দলীয় মার্কা ও নির্ধারিত। ইহার জন্য কোন দ্বিমতের কারন নাই। যৌথ দলের আদর্শ ছাড়া সকল দলের অস্থিত্ব রক্ষার্থে ৫টি নিয়মনীতিতে তালিকা প্রণয়ন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার।

০১) দলীয় সদস্য বাংলাদেশে বসবাসরত হতে হবে ও তাহার জাতীয় পরিচয় পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, দলীয় সদস্য সনদ ও নি:র্দলীয় সনদ ইত্যাদি এবং প্রবাসীদের বেলায়। ইহা ছাড়া প্রবাসী কার্ড থাকতে হবে।

০২) দলীয় আচরণ বিধি ও দলীয় গঠনতন্ত্র থাকতে হবে।

০৩) আইন আদালতে দোষী ব্যক্তির সাজা ভোগের পরবর্তী সময় ৪ বৎসর পরে দলীয় সদস্য হতে পারবে কিন্তু খুনি, ধর্ষক ও চুরি-ডাকাতি মামলায় সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিষিদ্ধ।

০৪) ঋণ খেলাপী ব্যক্তি বা দল দলীয় আচরণ বিধিতে দল গঠনে নিষিদ্ধ, এমনকি দলীয় নেতৃত্বে আসতে পারবে না।

০৫) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিচারক ও সেনা কর্মকর্তা অবসর গ্রহনের ৩ বৎসর পর দলীয় নির্বাচনে ও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। কিন্তু অবসরের পর যৌথ দলীয় সদস্য হতে পারবেন এবং নিয়ম নীতি পালনে বাধ্য থাকিবেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে দলের সহযোগিতায় আসতে **পারে।**

নির্বাচন ব্যবস্থা দুই ধারায় বাস্তবায়ন,

(১) সাংবিধানিক ও (২) সাংগঠনিক ব্যবস্থা।

(১) সাংবিধানিক নির্বাচন ব্যবস্থা বলতে সংসদ সদস্য নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সাংবিধানিক নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নির্বাচন বিষয় রাষ্ট্রপতির দপ্তর রাষ্ট্রপতির নির্দেশে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দিন তারিখ নির্ধারিত হবে।

০২। জাতীয় ও সংসদ নির্বাচনে অবসরপ্রাপ্ত বিভাগের বিচারকগণ বা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ আদালতের (জেলা জজ ও হাইকোর্ট) বিচারপতিগণ রিটানিং কর্মকর্তার পদে পদায়ন, দায়িত্ব পালন সক্ষম ব্যক্তি। তাহাদের সহযোগিতায় কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা বা অবসররত কর্মকর্তা (এডিসি বা এডিএম পদ মর্যাদাবান কর্মকর্তা)।

০৩।   ১ম শ্রেণি পদমার্যাদার ০৫ বৎসর সরকারি চাকরিরত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসার পদে পদায়ন তাহার স্থায়ী চাকরি অতিরিক্ত দায়িত্ব বলে গণ্য। সরকারি ও বেসরকারি কলেজের প্রভাষক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ উক্ত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাহার চাকরির বয়স ৫ বৎসর অতিবাহিত।

০৪।   নির্বাচন গ্রহণ কর্মকর্তা ২য় শ্রেণি ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ১০ বৎসর স্থায়ী চাকরিরত ব্যক্তি অথবা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভাষকগণ ১০ বৎসর চাকরিরত বয়সের চাকরিরত ব্যক্তি অংশ নিতে পারিবে অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কর্তব্যের জন্য বিবেচনায় আসতে পারে। যাহাদের পূর্বে নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

০৫।   নির্বাচন ব্যবস্থায় নিরাপত্তার জন্য বিজিপি, পুলিশ ও আনসার নিয়োজিত থাকবে। এমনকি স্পর্শকাতর কেন্দ্রে সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন নিশ্চিত। উক্ত ব্যবস্থা মোট কেন্দ্রের দুই তৃতীয়াংশ কেন্দ্র হতে পারে। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ম্যাজিষ্ট্রেসী ক্ষমতা দেওয়া থাকবে।

০৬।   ভোট কেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং কর্মকর্তা সর্বক্ষমতার অধিকারী। তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেসী পাওয়ার দেওয়া হবে। ভোট গ্রহণ শেষে প্রকাশ্যে জন সম্মুখে ফলাফল ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। ইহাই মূল ঘোষণা। ইহার ধারাবাহিকতায় ফলাফল দ্বিতীয়বার পুনরায় জনসম্মুখে ও মিডিয়ার সামনে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা যার যার নিজ কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করবেন রিটার্নিং কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এবং একত্রিকরণ ফলাফল নির্বাচন কমিশন পাঠানো হবে গেজেটের জন্য। নির্বাচন কর্মকর্তার দপ্তর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গেজেট প্রচার করিবেন।

০৭।   কোন কেন্দ্রে জটিলতা দেখা গেলে ভ্রাম্যমান আদালতকে অবহিত করিয়া বা তাহাদের উপস্থিতিতে স্থগিত ঘোষণা করিতে পারিবে। প্রিজাইডিং কর্মকর্তা আপীলে সঠিক প্রমাণ না হলে উভয় কর্মকর্তার শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। পরবর্তীতে ঐ কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। ইহার পূর্বে উক্ত কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত থাকবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত।

০৮।   নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী কেন্দ্রের মধ্যে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা অধিনস্থ থাকিবে। কাহারো কর্তব্যে অবহেলা বা কোন সদস্যের পক্ষে কাজ করিলে তাহাকে ভ্রাম্যমান আদালত শাস্তি নির্ধারণ করিবেন। সর্বোচ্চ শাস্তি ২-৫ বৎসর জেল।

০৯। প্রতিটি কেন্দ্রে যৌথ দলের প্রার্থীর স্বাক্ষরিত পত্র সহ যৌথ দলের ভোটার ব্যক্তি পুলিং এজেন্ট দায়িত্ব পালন করিবেন। ৬টি দলের ও নি:র্দলীয় দলের জন্য একজন করিয়া মোট ৭(সাত) জন পুলিং এজেন্ট থাকবেন। প্রতি কেন্দ্রে ২টি কক্ষ ভোট গ্রহণ ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। ১টি পুরুষদের জন্য ১টি মহিলাদের জন্য। প্রতিটা কক্ষে ৬টি করিয়া ভোটার প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন প্রতিবারে।

১০। পুলিং এজেন্ট ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সনদ নাম্বার ও যৌথ দলীয় সনদ ও ভোটার কার্ড, জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার, শিক্ষা সনদ ও ভোটার নাম সহ প্রার্থীর পত্রে উল্লেখ থাকবে।

১১। পুলিং এজেন্ট ব্যক্তি কোন প্রকার ভোট গ্রহণে অনিয়ম দেখলে নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিয়া প্রিজাইডিং কর্মকর্তার বরাবর পূরণকৃত ফরম আবেদন হিসাবে পেশ করিবেন এবং প্রতিস্বাক্ষর (প্রিজাইডিং অফিসার) সহ ফরমটি প্রার্থী বরাবর হস্তান্তর করিবেন এবং সাথে সাথে ভ্রাম্যমান আদালতকে অবহিত করিবেন। আদালত তাৎক্ষনিক অনুসন্ধান সহ বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন এবং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হলে সাজা ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আপীলযোগ্য।

দফা-৫ঃ ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা-

(০১) ভোটার তালিকায় ভোটার নং, নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও জাতীয় পরিচায় পত্র নং লিপিবদ্ধ থাকবে কেন্দ্র ভিত্তিক।

(০২) ভোটার কার্ড ভোট গ্রহনের পূর্বে ভোটারকে দেওয়া হবে। এখানেও ভোটার নং, নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র সহ ঠিকানা থাকবে। কার্ডটি যৌথ দলীয় প্রার্থীর স্বাক্ষর ও নি:র্দলীয় ভোটার এবং প্রশাসন ভোটার ও নতুন ভোটার (১৮ বৎসর, ২২ বৎসর) নি:র্দলীয় ভোটার কার্ডে সেবাদান প্রতিষ্ঠানের প্রধানের স্বাক্ষর থাকবে। এই নীতি ভোটার উপস্থিতির স্বাক্ষর বহণ করবে। যদি কোন ভোটার কার্ড জালিয়াতী হয় ভ্রাম্যমান আদালত ২ বৎসর পর্যন্ত শাস্তি দিতে পারিবেন। পরবর্তীতে আদালতে ক্রমান্বয়ে আপীলযোগ্য।

(০৩) ভোটার কার্ড ও ভোটার তালিকা মিলিয়ে প্রবেশ পথে অর্থাৎ ফটকে কর্মকর্তাগণ অমোচনীয় কালী সহ ভোটার নাম সম্বলিত স্লীপটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে কক্ষে প্রবেশ অনুমতি দিবেন ইহার সংখ্যা ১ হইতে ৬ জন করিয়া কিন্তু ভোটার কার্ডটি সিলকৃত বাক্সে ফেলে দিবেন। প্রবেশ স্লীপ অনুযায়ী ব্যালট পেপার মুরিতে প্রত্যেকের টিপ নিয়া ভোট পেপার ও সীল সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ইস্যু করিবেন। পুনরায় বাহিরে বারান্দায় গোপন কক্ষে তাহার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিয়া সীল ফেরত দিবেন এবং ভোটটি সীলকৃত বাক্সে ফেলবেন। বাক্সটি ৮'x৮'x৭' লোহায় ঘেরা ৫"x৫" ছিদ্রযুক্ত জালির ভিতরে থাকবে। সহজে হাত দ্বারা বাক্সে ভোটটি ফেলবেন। আপনাকে সকল মানুষ দেখতে পারবে। এক সাথে ১০ জন পর্যন্ত নারী পুরুষ আলাদা ভোট প্রয়োগ করতে পারিবেন। লোহার খাচার তিন দিকে ভিতরে ভোটার বাক্সগুলি সাজানো থাকবে।

(০৪) জনসাধারনগণ ৭০ মিটার দূরে ঘেরাও করা সীমানার বাহিরে থাকিবেন। শুধু ভোটার আসা যাওয়ার জন্য ৪টি পথ থাকবে (২টি মহিলা এবং ২টি পুরুষ)।

(০৫) উক্ত ব্যবস্থা স্থানীয় নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রয়োজনে স্থানীয় সেবাদান প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেওয়া যাবে।

(০৬) ভোটার ব্যালট পেপারে যৌথ দলীয় ৬টি মার্কা সহ নি:র্দলীয় ১টি প্রার্থী মোট ৭টি মার্কা সহ প্রার্থীর নাম থাকবে। কিন্তু কোন কারণে কোন যৌথ দল না থাকা বা ভোট গ্রহনে অযোগ্য হলে তাহার মার্কা ও নাম ছাপা হবে না।

(০৭) ভোট গ্রহণ হিসাব ও ব্যালট পেপার হিসাবে কোন প্রকার অনিয়ম সন্দেহ হলে উভয়ে কার্ডের হিসাব গণনা করা হবে। কোন অবস্থায় ভোটার কার্ড বাক্স খোলা হবে এবং গণনা তালিকা সংযোগ হবে। উভয় বাক্সগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য দলীয় নির্বাচন কমিশনে সীলমোহরকৃত বাক্সগুলি জমা থাকবে (পুলিং এজেন্ট ও সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তার স্বাক্ষর সহ)।

(০৮) ভোট গণনা শেষে ভোটার কার্ড গণনা করা হবে। পুনরায় ব্যালট পেপার ও ভোটার কার্ড বাক্স ভোটার তালিকা সহ পুলিং এজেন্ট স্বাক্ষরসহ ফলাফল তালিকাটি একটি বাক্সটি সীলমোহর করিয়া প্রিজাইডিং কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচন অফিস উপজেলায় জমা থাকবে।

(০৯) যদি কোন কারনে পুণরায় গণনার প্রয়োজন হয় ইহার জন্য উক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আদালত মাধ্যমে প্রমাণের জন্যও এই ব্যবস্থা। আদালত ছাড়া খোলা নিষেধ।

(১০) প্রত্যেক পুলিং এজেন্টগণ প্রতিটা ভোটারের নাম্বার সংরক্ষণ করিবেন। তাহাদেরকে সাক্ষীর পর্যায়ে ধরা হবে।

ভোট গ্রহণ সময় ও ইহার ব্যাখ্যা-

(০১) সংসদীয় আসন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য সকাল ৭:৩০ মিনিট হতে একটানা বিরতিহীন বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ কাজ চলবে।

(০২) কোন কারনে বিলম্বিত হলে বা সময় সংকুলান না হলে ৭০ মিটার ঘেরাও এলাকার মধ্যে ভোটার প্রবেশ করিলে তাহার জন্য ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা থাকিবে।

(০৩) উক্ত সময়ের মধ্যে শরীর অসুস্থ ভোটার বা বয়স ভিত্তিক ভোটার যাহারা অন্যের মাধ্যমে ছাড়া ভোট প্রদান সম্ভব নহে তাহাদের জন্য তাহার নিকটাত্মীয় (অবশ্য ভোটার হতে হবে) সাথে ভোট প্রদান সম্ভব হবে।

(০৪) প্রবাসীদের ভোটার ফরম পূরণ সহ বংলাদেশ দূতাবাস দ্বারা সীলসহ স্বাক্ষরিত দেশে পাঠিয়ে দিবেন ভোট গ্রহণের ২০ দিন পূর্বে ভোটার তালিকা অনুযায়ী নিকটাত্নীয় নামে (পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, বোন) পূরণকৃত ফরম ১টি খামে পাঠাতে পারিবেন কিন্তু খামের উপরে নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র নং এবং ভোটার নাম্বার থাকতে হবে। সীলমোহরকৃত খামটি পোষ্টাল ভোটার হিসাবে গণ্য হইবে। উল্লেখ্য যে, ভোটার যদি যৌথ দলীয় সদস্য পদ ভোটার হয় তাহার এবং নমিনি স্থানীয় লোহার বেষ্টিতে ফেলিবেন। গণনার সময় ভোটার খামটি খোলা হবে এবং গণনার পর পুনরায় একত্রে বাক্সে রাখা হবে।

(০৫) প্রবাসী ভোটার পূরণ খামটি সহ প্রিজাইডিং কর্মকর্তার আদেশে ভোটার স্লিপ পূর্ণ করিয়া বাক্সে সংরক্ষণ করিবেন। যদি কোন কারনে ভুল প্রমাণ হয় ভোটার এবং ভোটদানকারী উভয়ের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ভ্রাম্যমান আদালত ২ বৎসর জেল জরিমান করিতে পারিবেন।পরবর্তীতে আদালতে আপীলযোগ্য ক্রমান্বয়ে।প্রবাসী ভোটার তাহার আত্নীয়ের নিকট পাঠানোর পর ঐ আত্নীয় স্থানীয় নির্বাচন অর্থাৎ উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্তি স্বাক্ষরসহ সীলমোহর তারিখ সহ খামের উপরে থাকতে হবে। কোন কারনে খাম খোলা যাবে না। উল্লেখ্য যে, নমীনী ও ভোটার নাম সঠিক বলিয়া লিখিত সীল ব্যবহার করিতে বাধ্য। ইহা কম্পিউটারে সংরক্ষন করিতে

৮ম ধারা

শিক্ষার মান উন্নয়ন, গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরণ-

(১) ভূমিকাঃ শিক্ষা

শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদন্ড। তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার হাতিয়ার। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারে মানুষের ভেতর নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করে। জীবনে মূল স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। এছাড়া জাতির উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারেনি। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশি উন্নত। সুতরাং জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি।

জাতীয় জীবনে অগ্রগতির মূলমন্ত্র হল শিক্ষা। দেশ ও জাতির বড় সম্পদ হচ্ছে তার জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভন নয়-এটাই আজ জাতীয় স্বীকৃত ও সত্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল হলেও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাকে বাস্তবমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের জন্য বহুমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। দেশ ও সমাজ উন্নতির লক্ষে নানামুখী পদক্ষেপ অপরিহার্য বিষয়মাত্র।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নীতি নৈতিকতার প্রয়োজন।

(১) নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ।

(২) শিক্ষার মান উন্নয়ন।

(৩) দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব।

(৪) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৫) গণশিক্ষা।

(৬) সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৭) বহুমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৮) কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা

(৯) শিশু শিক্ষা দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা

(১০) মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব

(১১) দেশ ও জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা

(১২) শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মান উন্নয়ন

(১৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার অবক্ষয়

(১৪) শিক্ষার পরিবেশের মান উন্নয়ন ব্যবস্থা

(১৫) শিক্ষার শ্রেণিবিন্যাশ এবং গুণগত মান উন্নয়ন

(১৬) অনৈতিক রাজনৈতিক মূক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

(১৭) উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি

(১৮) কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেকার সমস্যা সমাধান।

(১৯) নারী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পূর্বশর্ত। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে মহান করে গড়ে তোলে। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে পারে। শিক্ষার প্রসাব ঘটিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে শিশুদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার অগ্রগতির প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

সারাদেশ শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সচেতন করে তোলাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের মানুষের শিক্ষার উপর।

বাল্য শিক্ষা ঃ

প্রথমেই বলতে হয় বাল্য শিক্ষার হাতিয়ার র্ধম শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষা হলো প্রত্যেক ধর্মের মানুষের ঐশ্বরিক গুণাবলী প্রকাশের পথ সৃষ্টি করা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন আর তাহার সৃষ্টিকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। নিজেকে আদর্শবান মানষে পরিণত করা। নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া। ধর্মের প্রতি কাহারো অনুরাগ বা বিরাগের অবকাশ নেই। কারণ সৃষ্টিকর্তাকে পেতে হলে তাহার সৃষ্টির নির্দশনগুলি চিন্তাশাক্তির বিকাশ ও বহিঃ প্রকাশে অণিবার্য। কোনধর্মকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ প্রত্যেক ধর্মের মানুষর তাহর ধর্মের প্রতি অনেক বড় আত্নত্যাগের বিষয় জড়িত। অনৈক সাধনার প্রতিফলণ নিহিত। শ্রষ্ঠার অনুকূল না হলে ইহকাল ও পরকাল

সুখময় নয়। তাই শ্রষ্ঠাকে মনে প্রাণে নিজের কাছে পাওয়ার বাসনা সৃষ্টির পথ মূল ধর্মীয় শিক্ষা। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষা গুরুগণ যার যার ধর্ম সমন্ধে নীতি বাক্য রেখে গেছেন। ।

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ আজ তাহার ধর্মগুরু মহামানবের আদর্শনীতি অনুসরণ করে বেঁচে থাকার আশা পোষণ করেন এবং আমিও করে থাকি। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের ধর্মকে তাহার নিজ নিজ স্বত্বায় পালনের সমর্থনে সহযোগিতার হাত বাড়ায়ে দেওয়া তাহার মহত্বের লক্ষন। এখানেই মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। যার সমন্ধে জ্ঞান অর্জন, আর এই জ্ঞান অর্জন ঘুমন্ত শিশুর শিক্ষা অর্জনে নিহিত আছে। তাই জ্ঞানীগুণিরা মনে করেন দই হতে ৪ বৎসরের মধ্যে তাহার পিতা-মাতার ধর্মকে তাহার মনে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আশা। এই জন্য দেশের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের জন্য ধর্ম শিক্ষালয় ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য পাড়া মহল্লা, শহরে বন্দরে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষালয় বন্দোবস্ত করে ছোট ছোট শিশুদের কোমল মনের মধ্যে জ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা করা সমাজের নৈতিক দায়িত্ব। এখান হতেই যার যার ধর্ম শিক্ষার পথে,পথের আলো বিকাশিত করা।

আমার আপনার প্রত্যেকর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা মাত্র। বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জরুরী কারণ প্রত্যেক ধর্মের বা সৃষ্টির জন্য নিজস্ব ধর্ম প্রচলন আছে। যা প্রত্যেক মানষের নিজস্ব আধিপত্য। এখানে কাহারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই শিক্ষাকে বাল্য শিক্ষা বলা হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঃ-

নিরক্ষরতা জাতির জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নিরক্ষরতা শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয় এটি একটি মারাত্নক সামাজিক ব্যাধি। নিরক্ষরতার মূল শক্তি অশিক্ষিত। এই শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার পথ সৃষ্টি হয়। একটি শিশুর জন্মের পর প্রতি ধাপ কথা বলার আগ্রহ আর এই আগ্রহ শিক্ষার পথে।

যে শিক্ষার পথ বাল্যশিক্ষা পথ। বাল্যশিক্ষা কালে একটি শিশুকে প্রথমে তাহার নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষায়। আবার আচরণ উপলদ্ধি করানো। প্রত্যেক জাতীয় তাহার নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রথম অধিকার। এই অধিকার সম্পূর্ণ হলে শিক্ষার প্রথম অধ্যায় শেষ হবে। প্রত্যেকটি শিশু নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রসার লাভ করবে।

ধর্মীয় শিক্ষা ঃ-

নীতি নৈতিকতার জন্য একটি শিশুর ২ বৎসর পূর্ণ হলেই প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী জাতীয় অধ্যায় তাহাদের নিজ নিজ স্তরে বা ধর্মীয় শিক্ষালয়ে ২-৪ বৎসরের মধ্যে ধর্ম শিক্ষায় পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুকে ধর্ম শিক্ষার গুণাগুণ সম্পর্কে আদর্শনীতি শিক্ষায় পারদর্শী করা সামাজিক অধিকারে রূপে পরিগণিত করতে হবে। তারপর প্রত্যেক শিশুকে ৫-৬ বৎসর পূর্ণ হলে সামাজিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পদার্পন করা হবে। এখানে প্রত্যেক ছেলে মেয়ে একত্রে শিক্ষার জন্য মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার সময় ও প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় অনুভূতি অর্জনে জ্ঞানের আহরণে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি বিষয় নির্ধারিত থাকিবে। এই সময় ধর্ম সমন্ধে পরিপূক্ত করা বিষয় থাকবে। উক্ত ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত বা বাধ্যতামূলক। এই সময় প্রত্যেক শিক্ষালয়ে নির্দিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষাগুরু (প্রত্যেক ধর্মের জন্য) দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। এই শিক্ষার জন্য ২০০ নাম্বার পরীক্ষা থাকবে এবং ৫০ নাম্বারে সর্বনিম্ন পাশের জন্য নির্ধারণ। কারন দুনিয়া ও পরকালের শান্তি লাভের পথ সুগমের ব্যবস্থা। এখানেও কাহারো দ্বিমতের কারণ হতে পারে না।

সামাজিক শিক্ষা ঃ-

২য় ধাপঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ- (৬-১৬ বৎসর)

ইহার সূত্রপাত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর মাধ্যমিক শিক্ষার সময় শুরু। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে উহার কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মেধা বিকাশ শুরু হয়। এমনকি একটি শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থায়

পরিপোক্ততা দেখা দেয়। ফলে তাহাকে সাবালক বলে ধরা হয়। এখানেই প্রত্যেক শিক্ষাত্রীকে চরিত্র গঠনে আদর্শনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সময় ধরা হয়। প্রথম নাগরিক অধিকারের পূর্বশর্ত হিসাবে ধরা হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার আলাদা সময় প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে মেয়েদের দিনের প্রথম প্রহর সময় এবং ছেলেদের অপরাহ্ন সময় শিক্ষার কার্যক্রম চালু বাধ্যতামূলক হতে পারে। এখানেও কোন ছেলে মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা বিচ্যুতি না হয় তাহার জন্য উক্ত ব্যবস্থা প্রচলন থাকবে। কিন্তু এখানেও প্রত্যেক ধর্মের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। ইহা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষক এবং ছেলেদের জন্য পৃথক শিক্ষক দ্বারা পাঠদানে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ মেয়ে শিক্ষকগণ কোমলময়ী হয়। কঠিন হওয়ার জন্য কোন মেয়ে শিক্ষক তাহার আচার-আচরনে প্রকাশ পায় না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের মন মানুষের নৈতিক নীতির প্রতিযোগিতার অভাব থাকে। ছেলেদের থেকে মেয়েরা শিক্ষার সময় ধৈর্যশীল হয় এবং শিক্ষায় মনোযোগী হয়। কিন্তু ছেলেরা সামান্য সুযোগ পেলেই শিক্ষায় অমনোযোগী হয়ে পরে। ফলে শিক্ষার মান নিম্নমূখী হয়। প্রতিযোগিতার জন্য বহুমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

শিক্ষার সময়ঃ

মেয়েদের সকাল ৮:০০ টা হইতে ১২.৫০ পর্যন্ত এবং ছেলেদের জন্য ১:০০ হইতে ৫.৫০ পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রতি বিষয় ৪০ নাম্বার পাসের নাম্বার থাকবে। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর কর্তব্য পরায়ন অর্থ পিতা-মাতার কর্তব্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিটি নাগরিকের ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমিকা থাকতে হবে। ফলে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম (১৬-১৮)

শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় ধাপ। এই ধাপে অনেক বিষয় পাওয়ার অধিকার অর্জন হয়। যেমন-জাতীয় পরিচয় পত্র, ভোটার হওয়ার এবং রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম পদক্ষেপের সৃষ্ট পথ সৃষ্টি। উক্ত শিক্ষার সময়কাল ১৮ বৎসর পর্যন্ত। এমনকি কর্ম ক্ষমতার প্রথম পর্ব শুরু হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ছেলে মেয়েদের পৃথক প্রথম শিক্ষার সময় থাকতে হবে। একই নিয়মে মেয়েদের জন্য সকাল ৮:০০ টা হতে ১২:০০ টা পর্যন্ত এবং ১ টা হতে ৫ টা পর্যন্ত ছেলেরা ক্লাস হবে প্রতিটা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে। মেয়েদের শিক্ষার সময় কোন ছেলের আসা যাওয়া নিষিদ্ধ এবং ছেলেদের ক্লাসের সময় কোন মেয়ে আসা অবাঞ্চিত। ছেলেদের জন্য ছেলে শিক্ষক এবং মেয়েদের জন্য মেয়ে শিক্ষক অবশ্যই থাকতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৮টি বিষয় পড়াতে হবে। ৬টি বাধ্যতামূলক, ২টি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। বাংলা ইংরেজী সহ প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে শিক্ষনীয় বিষয় থাকবে।

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ঃ-

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার সময়কাল ১৮ বৎসর হতে ২২ বৎসর অর্থাৎ ৫ বৎসর সময়। কিন্তু ২২বৎসর সময় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মনোনিবেশের বয়স। কিন্তু ২২ বৎসর ১ দিন পূর্ণতায় প্রত্যেক ব্যক্তি রাজনৈতিক যৌথ দলের সদস্য হিসাবে সনদপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য থাকিবে। ২২ বৎসরের পূর্বে কোন ছেলে মেয়ে রাজনীতিতে পদার্পন নিষিদ্ধ। ইহার সাংবিধানিক অধিকার রূপে পরিগণিত হতে পারে, আর নেতা-নেত্রী হতে হলে ২৫ বৎসর পার করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার মান আই.এ, বি.এ, এম.এ এবং সমমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। মেয়েদের জন্য ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যাংকার, কারিগরী শিক্ষা অর্থাৎ উৎপাদন বিষয় শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরি বাধ্যতামূলক এবং অফিসিয়াল পদে চাকরি করিতে পারিবেন। কোন মেয়ে মাঠের কাজ থাকে এমন বিষয় ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, বিজিপি এবং সেনা বাহিনীতে অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে চাকরি নিষিদ্ধ (যে সকল চাকরি মাঠ পর্যায়ে তাহা নির্দিষ্ট)। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের সময় আলাদা থাকবে। আলাদা সময় আলাদা শিক্ষালয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আলাদা ছাত্রাবাস থাকতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাঃ

সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষালয়ে থাকতে হবে। এমনকি বিদেশের হতে সর্বোচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রবাসী শিক্ষায় ইংরেজী সহ বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশী ভাষা জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এমনকি বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ প্রয়োজন থাকতে হবে। বিশেষ করে প্রবাসী চাকরির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি এবং কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন থাকতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাহাকে জাতীয়ভাবে **১**ম শ্রেণির নাগরিক বলা হবে। তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তাহাদেরকে বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা দেওয়া হবে। বেতন-ভাতা মূল্যায়ন তাহাকে **১**ম শ্রেণির ব্যবস্থা থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের

কর্মচারী তাহাদের বেতন **১**ম স্তরে পাওয়ার অধিকার রাখে। সকল বৈষম্য দূর করা দলীয় অধিকার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা।

<u>নারীর শিক্ষায় ক্ষমতায়ন</u> ঃ

পৃথিবীতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যানের ক্ষেত্রে নারী ক্ষেত্রে নারী জাতির ভূমিকা অপরিসীম। কোন জাতির সামাজিক উন্নতি ও সাংস্কৃতি উৎকর্ষের জন্য দেশের নারী পুরুষ সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। নারীকে উচ্ছ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাহাকে পারিবারিক শিক্ষা ঘর সংসার পরিচালনার জন্য শিক্ষা এবং ছেলেমেয়ে লালন পালনের জন্য মেধাবিকাশ প্রয়োজনের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বামীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে নারীদের গাত্রদাহ অবক্ষয় বিদ্যমান।

নারীর জীবন সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ আদর্শবান নাগরিক আত্ন প্রকাশ করে। তাহা সকল নারীকে অবগত হতে হবে। একজন নির্বাচিত নারীর প্রথম কর্তব্য পিতা, মাতা, পরে স্বামী সন্তান। শ্বশুর, শ্বাশুড়ীদের খেদমত প্রত্যেক নারীর কর্তব্য। ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত একত্রে বসবাস একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে। কারণ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। তাহার পুত্রবধু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেতে সবসময় আশাবাদী। কারণ তাহার মেয়েটি অন্য ঘরে চলে যাওয়ায় ইহার পূর্ণতা পূরণ প্রত্যেক নারী-বধু নৈতিক কর্তব্য। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর তার অধিকার সংরক্ষিত হলে কাহারো কোন বলার থাকে না।

নারীকে সমাজে মূল্যায়ন করতে হবে। তাহাকে শ্রদ্ধাচিত্তে দেখা হবে, তাহার প্রতি সদয় আচরণ থাকতে হবে। কারণ তাহারা মা জাতি। কথাটা মাথায় রাখতে হবে। তাহাদের উপর কোন জুলুম নির্যাতন করা শুধু সামাজিক ব্যাধি। ইহা দূর করা জাতীয় অধিকার। মা জাতির মূল্যায়নে নানা পদপেক্ষ নেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। তাহাদেরকে সামলম্বী করা বা ধরে রাখার দায়িত্ব সমাজের ও রাষ্ট্রের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের। এই প্রত্যাশা

জনমানুষের। যদি শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীকে অবমূল্যায়ন করে ছেলে ঐ মহিলাকে ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিবে না। যদি তাহার আচরণে প্রকাশ পায়, নীতি নৈতিকতা বোধের বিপক্ষে বহি:প্রকাশ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে অর্ধেক নারী। ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কার বাংলাদেশ নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই পথ হইতে সকলকে বের হয়ে আসতে হবে কিন্তু কোন নারীর আচরণ চলাফেরায় দৃষ্টিগোচর মনোভাব হয় না- ইহার দিকে মনোযোগ থাকবে হবে। নারী শিক্ষা সম্পর্কে অতীতের তুলনায় আজকাল জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেস্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৯ম ধারা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ-

আইনের শাসন বলতে “রুল-অব-ল” ইংরেজী এই ৩টি শব্দের অর্থ আইনের শাসন। আধুনিক মূল্যবোধ আইনের শাসন আজ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে এক অবিচ্ছেদ্য ভিত্তিরূপে পরিগণিত হচ্ছে।

এই শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিশেষ যেখানে সরকারের সকল ক্রিয়াকর্ম আইনের অধীনে পরিচালিত হবে, সেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্দ্ধে। রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করে থাকে। ফলে রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের কোন অধিকার লঙ্গিত হলে সে তার প্রতিকার পাওয়ার আশা করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক বিষয় বিদ্যমান। যেমন-

(১) ১টি স্বাধীন বিচার বিভাগ বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। যে কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমান। আর এজন্যে ১টি গণতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

(২) আইনের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা নির্ধারণ।

(৩) মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামাজিক কল্যাণ ও সুশিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমিকা-

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান, সাংবিধানিক আইনের অধিকার সংরক্ষণ।

বিশেষ করে জণগনের ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। বিশেষ করে শাসন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা জনগনের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। কারণ ক্ষমতায় যদি কোন ভারসাম্য না থাকে কখনো গণতন্ত্র বিকাশিত হয় না।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রথম হরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ সমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং (কর্মস্থল নির্ধারণ পদোন্নতির দান ও ছুটি মঞ্জুরী সহ) সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহার প্রযুক্ত হবে।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করে সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়। এভাবে সুপ্রীম কোর্টের তথা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতাকে উপেক্ষিত ও খর্ব করা হয়েছে। যা সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ফলশ্রুতিতে বিচার বিভাগে বিভিন্ন জটিলতার ও ভারসাম্যহীনতা দেখা আইন ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবনে চরম অবক্ষয়ের চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে। আমাদের সমাজের সামনে আজ কোন আদর্শ নেই, নেই অনুপ্রাণিত করার মতো কোন মহৎপ্রাণ মানুষ। ঘরে বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র।

একদিকে রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অপরদিকে অর্থনৈতিক দুর্দশা-শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য, সমাজ সেবার নামে নিজের স্বার্থ হাসিল এবং কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি কর্মকান্ডের ফলে সমাজ জীবন বাধাগ্রস্থ। বিশেষ করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে কিন্তু অভানীয় দুর্নীতি ও দূরবস্থা, শিশু পাচার, এ্যাসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আইনের বাণী লম্বা যাহা প্রতিকারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু ইহা ধীরগতি।

দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজন সুস্থ গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, নীতিবোধ ও জবাবদিহীমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া করা এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান। সর্বোপরি সংবিধানে যে সব আইন নাগরিকে স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার বাধাপ্রাপ্ত করে সে সব আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জনগনের উপর নির্ভরশীল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।

বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগ হতে আলাদা থাকতে হবে, বিচার বিভাগ স্বাধীন শুধু জবাবদিহীতার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ। শুধু সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত থাকিবে। বিশেষ করে বিচারকদের ব্যক্তিগত জবাবদিহীতার জন্য সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের কর্মপন্থা উচচ আদালতের নিকট দায়বদ্ধ।

বিশেষ করে রাজনৈতিক অভিযোগ, হয়রানী অভিযোগ, গায়েবী মামলা, মিথ্যা মামলা ইত্যাদির জন্য আসামী বাদী উভয়ের আনীত অভিযোগ বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হলে যে কোন পক্ষের জন্য শাস্তি অবধারিত। এমনকি মিথ্যার জন্য বাদী বিবাদীর রাখা পরামর্শকারী অর্থাৎ উকিল মুক্তারদেরকেও বিচারের আওতায় আনা হবে। কারণ টাকার বিনিময়ে তাহারা মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা দ্বারা জেতানোর ব্যবস্থা করে। যদি কোন মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে কোন আদালতে তাহা হলে নিম্ন আদালতের পরিমর্শকসহ বিচারকের জন্য সাক্ষীর ব্যবস্থা থাকিবে। কেহই আইনের উর্দ্ধে নয়। কোন কোন কাজ করিতে হলে ভেবে চিন্তে কাজ করিতে হবে। যদি কোন মামলা হয়রানী এবং উদ্দেশ্যমূলক বুঝায় কোন আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সামাজিক তদন্ত এবং সুশীল সমাজের তদন্ত করিয়া বিচার কার্য সমাধান মনে করি। পুলিশি তদন্ত কোন মূল ভূমিকা নয়। হয়রানী, মিথ্যা মামলা, গায়েবী মামলার জন্য যে কেহ বাদী হলে মিথ্যার জন্য তাহাকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে।

ধারা--১০

ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা অর্জন ঃ-

জাতীগত বৈষম্য নিরসনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হলো সেতুবন্ধন। ইহার মূল বিষয় হলো বর্তমান বিশ্বে বহুজাতীয় সমবায়। প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব সভ্যতা থাকে। বস্তুনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনে প্রত্যেক জনগোষ্ঠির আলাদা আলাদা ধর্মীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতীই তাহার নিজ ধর্মের উপর বিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল। আদিকাল হতেই উক্ত ব্যবস্থা চলে আসছে। কোন ধর্মই ছোট বলার অবকাশ কাহারো নেই। কারণ তাহারা তাহাদের নিজ ধর্মকে একনিষ্ঠভাবে তাহার উন্নত জীবনের লক্ষে বিভিন্ন নামে স্রষ্ঠার নাম স্মরণ করেন। ইহাতে তাহাদের আমাদের আত্মতৃপ্তি প্রশমন হয়।

মানুষ আল্লাহ মানা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির কালে একই আকৃতিতে ইহজগতে পাঠান। কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিকতার আদলে পরিবর্তন। সৃষ্টিকর্তা কাহারো উপর জোর করে কোন প্রকার রীতিনীতি বা ধর্ম চাপিয়ে দেননি। প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল-পাত্র পরিবর্তনে তাহার জাতীয় ধর্ম প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বর্তমান বিশ্বে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টাণ ও ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। কোন লোক ধর্ম ব্যতিত নহে। প্রত্যেকেই তাহার নিজস্ব নিয়মনীতিতে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণকরেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম হয় না। যে কোন ভূ-খন্ডে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বসবাসেরসুযোগ করে দিয়েছেন। এই সুযোগে সকলেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দিনতিপাত করছে। সৃষ্টিকর্তা

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন জীবিকা নির্ধারিত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আবার ফেরত নেওয়ার ব্যবস্তা দিয়েছেন। প্রত্যেকের বিশ্বাস জন্ম হলেই মৃত্যু অবধারিত। এখানে কোন সংশয় নেই। শুধু পৃথিবীতে মত পার্থক্যের স্থান ,একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল । হিংসা বিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে একে অপরের প্রতিপক্ষ মাত্র।

প্রতিটি মানুষ তাহার নিজ ধর্ম পালনে সক্ষম ব্যক্তি, কোন নির্দেশের অবকাশ নেই।

প্রতিহিংসা শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান। এখানে সম অধিকার নাই বললেই চলে। যার যার নিজস্ব্য ধর্ম পালনে প্রত্যেককে সুযোগ দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বা দেশের অধিকার বটে। আপনার আমার শুধু একে অপরের প্রতি সহযোগিতা প্রদান মাত্র। ধর্ম পালনে এবং নাগরিকত্ব অধিকার অর্জনে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রকাশ প্রত্যেকের নিকট দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনে সম অধিকারে এখানে কোন ভেদাবেদ নাই। দেশের উন্নতির জন্য প্রত্যেকের সমান অধিকার-এই অধিকার বলে আপনি আমি একত্রে রাজনৈতিক বন্ধনে দেশ ও জাতীর মঙ্গলে আত্মনিয়োগ এবং অধিকার করে থাকি।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সকলের উপার্জন ক্ষমতা একইভাবে এক করে পাঠাইনি। তাহার ভাগ্য পরিবর্তনের সে নিজেই দায়ী। তাই কাহাকে ছোট বলে মনে করবে না। কাহারো প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রকাশ করবে না। ইহজগতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মফলের জন্য দায়ী। তাহার ভাল মন্দের বিষয়ের অংশীদার। ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সকল লোকের জন্য সকলেই দায়ী। একটি দেশের সার্বভৌমত্ব রাখার লক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকান। শুধু পার্থক্য যার যার সমর্থন তাহার সাধ্য মোতাবেক হবে।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা গণতন্ত্রের অস্থিত্বে সম অধিকার পরিপন্থি। রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার বলে রাষ্ট্রীয় সকল সংযোগ অংশীদার। ধর্ম পালনেও আপনার আমার অধিকার খর্ব করা যাবে না। আপনার যোগ্যতা অনুসারে আপনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক নাগরিক ও রাজনৈতিক সুবিধা সমহারে সকলে সমান অধিকারী। আপনি আমি যোগ্যতাবলে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতে পারি।

সামাজিক বন্ধনে একে অপরের জন্য সহযোগী অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করানোর সমর্থ নেই, এখানে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, কোন ব্যক্তির ছেলে মেয়ে অর্থ অভাবে বিয়েশাদী দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এখানে সামাজিক বন্ধনে আপনার আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অপরিহার্য ভূমিকা। একে অপরের প্রতি শত পরামর্শ দেওয়া মহত্বের লক্ষণ। ধর্মকে কখনও রাজনীতিতে যুক্ত করবেন না। ধর্ম শুধু যার যার, কর্ম তার নিজের আর রাজনীতি শুধু সকলের সমঅধিকার। আপনার কর্মকান্ডের ফল প্রশংসিত হলেই দেশের মঙ্গল আপনার আদর্শনীতি দেশের গৌরব বয়ে আনবে।

এক কথায় সকল গোত্রের ধর্মের এবং নাগরিকত্বের অধিকার যে বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাহার নিজস্ব বিষয়। আপনার প্রতিবেশীর প্রতি প্রতি যত্নবান হন। তাহার ভালমন্দের জন্য শরিক হন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

অধিকার, ভাল কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং মন্দ কারো প্রতি সুপরামর্শ প্রদান করা। একে অপরের প্রতি বন্ধন অটুট, কারণ দুর্বলের প্রতি সবলের আধিপত্য বিস্তার, সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কাহারো প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন মোটেও ঠিক না।, কারণ আপনার কর্মফল আপনি সৃষ্টি করেন না ইহা সৃষ্টিকর্তার হস্তপেক্ষ মাত্র। আপনাকে বুঝার শক্তি দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা। তাই বিবেক বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনায় সম অধিকার প্রতিষ্ঠা সকলের মঙ্গল। কাহারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রদর্শন এবং অশালিন আচরণ হতে বিরত থাকা সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার লঙ্গন কখনো সুফল হয়ে আসে না। এক সময় না এক সময় পরিবর্তন হয়ে যায়।

বিশ-মানবতা দুয়ারে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক দেশের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল বয়ে আনে। প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের নির্যাতিত মানুষের পাশে সকলের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় অধিকার। আপনার ধনী বা প্রভাবশালী হওয়ার পেছনে কাহারো হাত নাই- শুধু সৃষ্টিকর্তা আপনার ত্রানকর্তা।

ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা অর্জন ঃ-

সকল ধর্মের মানুষের ভাগ্যলিপি সৃষ্টিকর্তার হাতে, এখানে জোর জবরদস্তি চলে না। শুধু চলে আপনার আমার সকলের প্রচেষ্টা, যার যার সাধনা নিষ্ঠা প্রচেষ্টা তাহাকে গন্তব্যের পথে নিয়ে যাবে, সকল প্রচেষ্টার মধ্যে চাই সামাজিক, রাজনৈতিক ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ।

সকল ধর্মের মানুষের রাজনীতি করার ইচ্ছা পোষণ তাহার অধিকার। মূল কথা হলো রাজনীতি যৌথ দলীয় সংগঠনে সকলের আশার অধিকার আছে। ধর্ম পালন তাহার নিজের অধিকার। শুধু একে অপরের জন্য সহযোগিতা কামনা। ধর্মকে কোন গোত্র বা জাতি রাজনীতিতে জড়ানো নিষিদ্ধ। মানুষ মাত্র সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টিকর্তার কল্যানে জন্মগত অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় আগমন। জন্ম সূত্রের অধিকারে যার যার ধর্ম বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, যাহা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বলা চলে। কিন্তু কোন ভাবেই কাহাকে ছোট করে দেখা যাবে না। সৃষ্টিকর্তা কাহাকেই এই অধিকার দেয় নাই। তাই সমাজের মাঝে রাজনৈতিক ভাবে একে অপরের ভাই ভাই এবং আমরা আমাদের বন্ধুত্বেও হাত প্রসারিত করা সকলের মহান আদর্শনীতি। রাজনীতির বেলায় আমরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

বিশেষ করে সকলে আলাদা আলাদা ধর্মভিত্তিক অধিকার, কিন্তু সংগঠন করিতে কোন বাধা নেই। ইহা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার। প্রত্যেকের সমাজ ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হতে পারে বা থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারে আপনি বিবেকবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, সম-অধিকারে নেতা-নেত্রীর আসন পেতে কোন বাধা নেই। এখানেও আপনার অধিকার চলবে এবং প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশীদের নাগরিক অধিকার। অর্থাৎ জন্মগত অধিকার থাকলেই আপনি রাজনৈতিক অধিকার পাবেন। রাজনীতিতে সম অধিকার, কোন ছোট বড় ভেদাভেদ নাই। আপনি ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠির নেতা-নেত্রী হতে পারেন। কিন্তু রাজনীতিতে যৌথ দলীয় সংগঠনে সদস্য আসন গ্রহণ প্রথম অধিকার। এই অধিকার বলে যে কোন রাজনৈতিক যৌথদলে আপানার আগমন দলের জন্য স্বাগতম, আপনার মতে বহিঃ প্রকাশ। আপনার ইচ্ছার প্রতিফলণ। শুধু রাজনৈতিক যৌথদলীয় রীতিনীতি অনুরসণ সকলের জন্য সাংগঠনিক অধিকার। কিন্তু রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা শুধু দেশের সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যৌথ দলীয় রাজনীতিতে সমঝোতা। শুধু সাংবিধানিক অধিকারে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীর সৃষ্টির লক্ষ্যে যৌথ দলের সম্পৃক্ততা বা একত্রিত হওয়া। আরো একত্রিত হওয়ার কারণ দেশের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব বজায় রাখা এবং অংশ নেওয়ার জন্য।

উপসংহার ঃ বিশ্বাস স্থাপনে সৃষ্টির লক্ষ্যে আপনার আমার প্রয়োজন হলে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার মনোভাব সৃষ্টি। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা। সকলের আর্থিক ও আত্ম সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় যৌথ দলীয় সাহায্য সহযোগিতার পথ সৃষ্টি করা। একে অপরের ধর্মের প্রতি বিরোপ প্রতিক্রিয়া না দেখানো মহত্বের লক্ষণ মাত্র।

ধারা-১১ ঃ স্বাস্থ্যসেবা আধুনিকায়নে রাজনৈতিক ভূমিকা ঃ-

আধুনিক মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিস্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন-মুদ্রণ যন্ত্র এবং বিদ্যুৎ। ইহা ছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে, যোগাযোগ ক্ষেত্রে, বিনোদনের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অকল্পনীয়ভাবে প্রসার লাভ করছে। মানুষের এ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিজ্ঞান আদি যুগ থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন যন্ত্র আবিস্কার করে মানব কল্যানে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে যে কোন দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে। তাহা সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় বা মেহেরবাণীতে প্রতিকারের ফল পাওয়া। মানুষের রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষুধের আবিস্কার, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশেষ করে রোগ নির্ণয় ও তারপর প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবদান শুধু উন্নতির কারণ রোগ না হওয়ার পরিবেশ সৃস্টি করা বর্তমান সময়ের জন্য প্রথম পদক্ষেপ। ইহার জন্য চাই সামাজিক সচেতনতা এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠির ইচ্ছার প্রতিফলন, যেমন-খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ বিষয় মানব দেহের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর বা রোগ উৎপত্তির উৎস কি-না ইহার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা, গ্রাম ও শহরের অলিতে গলিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করা এবং অবসানের জন্য রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা। কোন নেশা জাতীয় মরণব্যাধি হতে প্রতিটি ছেলে মেয়েকে আদর্শবান নাগরিক করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা জরুরী প্রয়োজন। বর্তমানে নেশা জাতের কারনে সাড়াদেশে ৬০% ছেলেমেয়ে তাহার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। অকালে বিভিন্ন রোগাক্রান্তে পরিণত হয়। সমাজ হইতে অস্বস্থিকর পরিবেশ বা নেশার বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে সামাজিক পরিত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরসনে সম্পৃক্ততা অর্জন।

রোগের উৎপত্তির কারণগুলি প্রথমে জনগোষ্ঠিকে অবহিত করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন যদি সচেতন হয়ে কোন অনিয়ম বা ভেজাল ব্যবস্থার প্রতিকার হবে। প্রতিটা মহল্লায় যৌথ রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সহায়তায় সামাজিক অনাচার এবং স্বাস্থ্য মরণব্যাধি নির্মূল করা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার মাত্র। রোগ হওয়ার চেয়ে রোগ না হওয়ার বিষয় এবং প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি সমাজের সামাজিক অধিকার।

আর যদি কাহারো মরণব্যাধি হইয়া থাকে ইহার প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক সামাজিকভাবে ধনী গরিব সকলের সম অধিকারে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসতে হবে। ইহা বর্তমান বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের ইহার বহি:প্রকাশ মাত্র, যেমন-মহাব্যাধি ক্যানসার, কিডনি ও হাড়জনিত রোগ ইহা ব্যয়বহুল ব্যবস্থা। ইহা প্রতিকারে সামাজিকভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। যাহার যতটুকু সমর্থ থাকে। তাহলে সমাজের ও দেশ-দশের মঙ্গল হবে। হবে দারিদ্র বিমোচন। ফলে মৃত্যুর হার কমে যাবে।

স্বাস্থ্য সকল সুখের কারণ। কথা দিয়া পারেন-টাকা পয়সা দিয়া পারেন এবং পরামর্শ দিয়া সরকারকে অবহিত করানোর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিতে সচেতন হয়ে পরামর্শ আপনার জন্য একটি জীবন মৃত্যুর হাত হতে ফিরে আসতে পারে। মৃত্যু অবধারিত ইহা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত প্রথা-কিন্তু আপনার আমার সকলের প্রচেষ্টায় একটি মরণব্যাধি রোগের জন্য অকাল মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে চলছে। বিজ্ঞানের আর্শিবাদে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের মাঝে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। বর্তমান সময়ে আর্থিক স্বচ্ছল ব্যক্তিরা ছুটছে বিদেশে চিকিৎসার জন্য, কারণ তাহারা অপর্যাপ্ত চিকিৎসা মনে করেন।

<u>চিকিৎসার জন্য ভূমিকা</u> ঃ-

বিংশ শতাব্দীর পূর্বে চিকিৎসা পদ্ধতি যতটা উন্নত ছিল বর্তমানে ইহার অগ্রগতির ফলে মানুষের গড় আয়ু ৫০-৭০ বছরে দাড়িয়েছে।

চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান আজ যুগান্তরকারী ভূমি রেখেছে। দূরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা আজ হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন পন্থায় আজ ক্যানসার, পিত্তথলি, কিডনি ইত্যাদি ব্যাধির অবস্থা নির্ণয় করা যায়। বিশেষ করে ঘাতক ব্যাধি এইডসের জীবাণু আবিষ্কার (১৯৮৪)। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই গুরুত্বপূর্ণ। রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম বিষয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি বয়ে আনার জন্য বর্তমান সময় সচেতন। যাহা রাজনৈতিক অধিকারে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম। চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের মাঝে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। তাই আমাদের দেশে চিকিৎসার মান উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অণিবার্য। সমাজের সর্বক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা এবং রোগ প্রতিরাধক বিষয় সচেতদন করা রাষ্টীয় অধিকার। এই জন্য বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ নৈতিক দায়িত্ব।

১। মহামারী প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাজনৈতিক মত ইচ্ছার বহি:প্রকাশ যৌথ দলীয় সংগঠন সচেতন হওয়া।

২। সমাজ হতে মরণব্যাধি, নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করা।

৩। ভেজাল খাদ্য-দ্রব্য চিহ্নিত করার সক্ষমতা আনা।

৪। পরিবেশ দূষণের স্বাস্থ্য রক্ষায় নানাবিধ পদপেক্ষ গ্রহণ।

৫। অস্বাস্থ্যকর স্থান নির্ণয়ে ভূমিকা রাখা।

উপসংহার ঃ রোগ শোক হতে মানুষকে বাঁচার অধিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানে আশার আলো।

৭০-৯০ বৎসর বাঁচার অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি। সকল ভেজাল খাদ্য পরিহার ইহার জন্য জনমত সৃষ্টি।

ধারা-১২

সমাজ ব্যবস্থায় দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং যানজট মুক্ত নগরায়ন ব্যবস্থা ঃ-

পরিবেশ দূষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন

পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে তার পরিবেশ। মানুষের রচিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তনের নিদর্শনের ফসল। যুগে যুগে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। পরিবেশ দূষণ হলো মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানের তথাকথিত পরিবর্তন। আমাদের চারপাশে যা কিছু বিদ্যমান তাহাই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ জীবনের অস্তিত্ব বা বিকাশের জন্য সামগ্রিক পারিপাশ্বিকতা। যেমন-ভৌত, অবস্থান নানা কারনে পরিবেশ দূষণ সমস্যা প্রকট থাকায় মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। ইহার মূল কারণ-

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, দারিদ্র, অপরিকল্পিত নগরায়ন, দ্রুত শিল্পায়ন,প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহার, বনভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার,গাড়ীর বিষাক্ত ধোঁয়া,

অপরিকল্পিত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার, পলিথিন ব্যবহার, কিন্তু ইহার সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই, অপরিকল্পিত রাস্তা ঘাট নির্মাণ, জলাশয় ভরাট ও অপরিকল্পিত স্যুয়ারেজ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নদীনালা সংস্কারের অভাব নদী নালা ভরাটের প্রবণতা।

মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার নেশায় বিভোর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ জলে-স্থলে মহাশূন্যে আধিপত্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু মানুষের উচ্চ আকাঙ্খার বিজয় মানুষকে পরাজয়ের মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে। আর

আমরা এক ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি। এই সমস্যা সমাজের নয়, জাতির নয়, আজ ইহা বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের পরিবেশ আজ নানাভাবে দূষিত। ইহার প্রতিকারে সম অধিকারে রাজনৈতিক পরিবেশ সকলে মিলে এগিয়ে আনতে হবে। মানব জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম হলো বায়ু, বায়ু দূষিত হলে মরণব্যাধির উপসর্গ বিদ্যমান হবে। যেমন-জটিল জৈবযোগ নিউক্লিয়াস আবর্জনা, জীবাশ্ম জ্বালানী অর্থাৎ তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া। নাইট্রিক অক্সাইড আলোকে রাসায়নিক ধোঁয়া সহ ইত্যাদি বায়ু দূষনের মূল উপকরণ। আরো আছে কলকারখানা, মোটর গাড়ি, ট্রেন, ঘরবাড়ী ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টির যন্ত্রপাতি এবং নানান আবর্জনা ইত্যাদি।

বায়ু দূষনের কারণ ঃ-

বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানী দহন ছাড়াও বায়ু দূষনের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে ইটের ভাটা, কলকারখানা এবং বিভিন্ন কারখানা ও রাসায়নিক ও ঔষধ তৈরী, শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন ও দরজা জানালার ও ওয়ার্কশপে ইত্যাদি উৎস থেকে প্রচুর পরিমান ধোঁয়া বাষ্প, গ্যাস ও ধুলিকণা ইত্যাদি বাতাসে মেশার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

পানি দূষণ ও দূষণ প্রক্রিয়া ঃ-

নগর পার্শ্ববর্তী নদীনালা ও জলাশয় ইত্যাদিতে শিল্প ও পৌরবৈর্জ ফেলার কারনে পানি দূষিত হয়। নগরের দূষিত পানি নদীতে ফেলার কারনে নদীর পানি সম্পূর্ণ দূষিত হয়। উক্ত পানিকে শোষণ করিবার ব্যবস্থা না থাকায় নানাবিধ কারনে নদীলানা দূষিত হয়। ফলে পানিবাহী রোগের উৎপত্তি হয়।

শব্দ দূষণ ঃ-

বর্তমান যুগের এক গুরুত্ব সমস্যা হচ্ছে শব্দ দূষণ। শহরাঞ্চলে শব্দ দূষণের মূল উৎসগুলি হচ্ছে মোটর গাড়ীর হর্ণ, পটকার আওয়াজ বেড়ে যাওয়ার আওয়াজ। ফলে শ্রবণকেন্দ্রীয় অকেজো হয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া বাসিন্দাদের শিশু সন্তান কমবেশী বধির হতে দেখা যায়।

মৃত্তিকাজনিত দূষণ ঃ-

মৃত্তিকা বা মাটি ভূত্বকের উপ-বিভাগের একটি পাতলা আবরণ। বিভিন্ন কারনে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে। যেমন-ভূমি ক্ষয়, বৃষ্টি, গাছ কাটা, বন উজাড়, জমিতে অতিরিক্ত বা নিয়মিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ইত্যাদি কারনে মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় ফলে মৃত্তিকা দূষণ হয়। রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার বিভিন্ন শাক-সবজির জন্য ক্ষতিকর হয় ইহা ব্যাহারে নানা ব্যাধি রোগের উৎপত্তি হয়। বিশেষ করে মাটির উর্বরতা নষ্টের মূল কারণ পাললিক ব্যবহার। ক্ষতিকর উপাদান থাকায় মাটিতে নষ্ট হয় না। প্রতিবছরে ব্যবহার করা সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

যেখানে-সেখানে ফেলা যাবে না। ময়লা আবর্জনার সাথে ফেলে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে। সংরক্ষন করিয়া পুনরায় ইহা নতুনভাবে তৈরী করে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মহানগরকে পরিবেশ বান্ধব শহর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঃ-

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ঘনবসতিপূর্ণ শহর। যাহার আশ পাশ মিলিয়ে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষের বসবাস। যাহার আনুপাতিক হারে যানবাহন চলাচলের জন্য আছে ঢাকার রাস্তায়।

ঢাকা শহরকে পরিবেশ বান্ধব শহর হিসাবে গড়তে হলে কিছু কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ অগ্রাধিকার। যাহার মধ্যে

(১) রাস্তাঘাট অপরিকল্পিত প্রথায় যানবাহন রাখার পরিবর্তন উত্তরণ।

(২) যানবাহন দূষণমুক্ত চলাচল ব্যবস্থা সংস্কার

(৩) প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পালনের ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধি।

(৪) অপরিকল্পিত অবকাঠামো নিমার্ণ বৈষম্য দূর করা।

(৫) রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবে ছোট ছোট যানবাহন চজলাচলে রীতিনীতি প্রচলণ

(৬) অপরিকল্পিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাজার ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব মূল্যায়ন করা

(৭) পরিকল্পনাহীন রাস্তা ঘাটে হাট বাজার জনজীবনের দুর্ভোগের সমাধান।

(৮) বিশেষ করে রুট ক্রসিং এ যানবাহন চলাচলে বিলম্বের প্রতিকার ও সমাধান।

(৯) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয় পরিহারে উন্নত সমাধান।

(১০) জলাশয় ভরাট ও অপরিকল্পিত সুয়ারেজ বৈজ নিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

(১১) অপরিকল্পিত রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও সংস্কার ব্যবস্থা বাস্তবমুখী করা।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে রাজধানী শহর ৩-৪ বৎসরের মধ্যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের অধিন ৮০% উন্নতির ধারা বজায় থাকে এবং যানজটমুক্ত নগরী প্রতিষ্ঠিত হবে। নগরবাসীর ও জনজীবনের দুর্ভোগ শূন্যের কোটায় নেমে আসবে। ঢাকা আধুনিক তিলোত্তমা শহরে পরিণত হবে। যাহা প্রতিয়মান ও বিশ্বাস।

জলবায়ু পরিবর্তনে রাজনৈতিক সমাধান।

জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে তার পরিবেশ। মানুষের পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তন ফসল। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে কাজে লাগাচ্ছে বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে। প্রকৃতিও যেমন ছিন্ন ভিন্ন তাতে রূপ নিয়ে মানুষের তথা সমগ্র প্রাণ ঠিক সমপরিমান বিরোধিতা করতে তৎপর। শতাব্দীর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিজয় গৌরব মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করছে। আজও করছে। ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষতিকর সব আবর্জনা ও বিষাক্ত গ্যাস। তার ফল হচ্ছে বিষময়। পরিবেশ দূষিত হয়েছে। পরিবেশের এই বিপর্যয়ের জন্য মূলত মানুষই দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনে এবং অভিযাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিশ্বজুড়ে অর্থাৎ সমুদ্র উপকুলবর্তী দেশগুলির আতংকের শেষ নাই। বিশাল জনগোষ্ঠি তিলে তিলে গড়ে তোলা ভৌত অবকাঠামো ও অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষি-এই তিনটি ক্ষেত্রে বিপন্নতা দেশের সার্বিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ধুলিসাৎ করে দিতে পারে। আইপিসিসি এক সমীক্ষায় প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে যে (২০০৭ সালে) গত শতাব্দীতে কার্বন ড্রাই অক্সাইডের পরিমান ২৫% নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমান ১৯% এবং সিমেন্টের পরিমান ১০০% বেড়েছে। উক্ত লক্ষনগুলি সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষন করলে পৃথিবীর বাসযোগ্য পরিস্থিতির সানসলোকে ভীতিকর হয়ে ওঠে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাস, সূর্যরশ্মিও তাপ পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে।

এই ধরনের গ্যাসের নাম গ্রিন হাজাউজ গ্যাস বলে। পাশ্চাতের শিল্পায়িত সমাজে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সাইট্রাস অক্সাইড মিথেল ইত্যাদি গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমান মারাত্নকভাবে বাড়ার কারনে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়েছে। এরই ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস মাত্র। উহার জন্য মানুষ সৃষ্টি। বিশেষত ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলি এর জন্য দায়ী। যে কোন দেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ বিষয়টি দিনকে দিন অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ছাড়িয়ে সামাজিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব ঃ-

প্রধানতঃ ভূপৃষ্টের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। দ্বিতীয়তঃ উষ্ণায়নের ফলে জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির পরিমান বৃদ্ধি পাবে। এতে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বাার সঙ্গে সঙ্গে প্লাবিত এলাকার পরিমান যেমন বাড়বে তেমনি পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে বড় বড় শহর। তৃতীয়তঃ উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গ্রিনল্যান্ড, এ্যান্টারটিকা সহ অন্যান্য ভূভাগের উপরিতলেৎজমা হওয়া বরফ গলে সমুদ্র জলে মিশে যাবে, এতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বন্যা, খরা, নদী প্রবাহের ক্ষীনতা, পানিতে লবণাক্ততা, সাইক্লোন, ঝড়, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন সহ নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জন বিপর্যয় ঘটাবে। বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞজনেরা জানিয়েছে হিমবাহগুলো আশঙ্কাজনকভাবে গলে যাচ্ছে এবং এতে মহাদেশের একটি বিশাল অংশ খরায় আক্রান্ত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশী। কারণ বিশ্বব্যাপী যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের আশংকা দেখা দিয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে অন্যতম স্থানে। মৌসুমী বায়ুর গতিপথ পরিবর্তন অনিয়মিত বৃষ্টিপাত খরা বন্যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকুলীয় এলাকা জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৩৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ৩ কোটি মানুষ গৃহহারা হয়ে যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু সংক্রান্ত গবেষনায় আশংকা প্রকাশ করেছেন প্রফেসর নরম্যান মাইরিস। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা গত ২০ বৎসর ৩ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। নিচু এলাকায় লবনাক্ত পানি প্রবেশের ফলে খাদ্য উৎপাদন ৪০% কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ধারা-১৪

বহি বিশ্বের সাথে পারস্পরিক বন্ধুত্ব নীতিতে অধিকার স্থাপন ঃ-

দ্বন্দ্ব নয় শান্তি এর লক্ষে ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর ৮২টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এক বিশ্ব সংস্থা যার নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বিশ্বের বিদ্যমান জাতিগুলির মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করাই ছিল মূল কাজ। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করার মহান দায়িত্ব ও জাতিসমূহের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল স্বার্থ রক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে কয়েকটি বিভাগ গঠিত আছে। যেমন-

(১) সাধারন পরিষদ, ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয় সকল সদস্য দেশের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মাধ্যমে নিস্পত্তি হয় সকল বিষয়ে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ কোন দেশে শান্তি বিঘ্নিত হলে জাতিসংঘের মাধ্যমে শান্তি মিশন দ্বারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থীতিশীল রক্ষা করা হয়। মধ্যস্থতা ও শালিসের মারফত আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ মিমাংসা করে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদঃ- বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে এ পরিষদ ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৪) বর্তমান বিশ্বের নিপীড়িত জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্গনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠি নীতিবান ও দমননীতি অবলম্বন করে। যেখানে কার্যকরী ভূমিকা পালনে জাতিসংঘের ভূমিকা সীমিত। আমার মতামত এখানে জাতিসংঘ বিশেষ পথ অবলম্বন করিয়া শান্তি রক্ষার জন্য আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে মিমাংসা করিতে পারা। তাহা মহামান্য

জাতীসংঘের প্রধানের দায়িত্ব হতে পারে। ইহার জন্য মিমাংসা করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। কারণ জাতিগত বিবেদ মিমাংসা এবং ব্যবস্থা নেওয়া মত পোষণ করে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। জনশক্তি ক্রমবর্ধমান বর্তমানে ২০ কোটির উপরে জনসংখ্যা ৫৬ হাজার বর্গমাইল ভূখন্ডের মধ্যে। কারণ ২০৫০ সালে জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটির মত হয়ে যাবে। তাই আমাদের সমন্ধে বিশ্বে সকল বিশ্ববাসীর নজর দেওয়ার বিষয়ে অনুরোধ জানাচিছ। যদি এই ছোট দেশটির সকল আশা আকাংখার পূরণ অর্থাৎ অর্থনৈতিক, ভৌগলিক ও সামাজিক ইত্যাদি তাহলে বিশ্ববাসীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। আমাদের আশা আকাঙ্খার শুধু ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বিশ্ববাসীর কাছে। বিশ্ববাসীদের কাজে আমাদের প্রত্যাশা ও বিশেষ অনুরোধ আমাদের নিয়ে বিশ্বের সকল দেশ সমান। আমরা কাহারো পক্ষে বা বিপক্ষে-কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বিবেচনা করা। আমাদের নিকট বিশ্বের সকল দেশ সম্মানীত। আমাদের কাহারো পক্ষে বা দিপক্ষে মতামতের বিষয় থাকবে না।

আমাদের আমদানী ও রপ্তানীতে ভারসাম্য রক্ষা করিতে প্রস্তুত। সকল দেশের সাথে সমান চাহিদার আলোকে নীতি পোষণ করিবো। বৈদেশী মুদ্রা অর্জন আমাদের লক্ষ্য, কারণ আমাদের নিজস্ব কোন আয়ের সংস্থান নাই। আমাদের প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর নিকট আমরা কোন প্রতিযোগিতায় যাবো না। শুধু সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিবো না। শক্তিধর দেশগুলির প্রতি আমাদের আর্জি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আপনাদের দ্বারা উৎপাদন ভাল কোম্পানীর পণ্য ক্রয় দক্ষিন হস্ত প্রসাব রাখবে অনুরোধ থাকবে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমাদের সকল ব্যবসা-বাণিজ্য মূল্য একটু বেশি। কারণ আমাদের চাহিদা পূরনে সময় লাঘব এবং অর্থের অপচয় কম হয়। আর আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানীতে শুল্ক সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ থাকবে। যেহেতু ঘণবসতিপূর্ণ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান বিবেচনা করা।

বাংলাদেশে দূর্যোগ ব্যবস্থায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেক হয়ে থাকে। ঐ সময় সাহায্য সহযোগিতা বিশ্ববাসীর নিকট আমাদের জন্য আর্শিবাদ । আমাদের সঠিক পথ আমাদের জন্য সম অধিকার চর্চা, সামাজিক গণতন্ত্র ও যৌথদলীয় রাজনীতির পরিবেশ সৃস্টি রাজনীতির জন্য রাজনীতি সঠিক পথ অবলম্বন আমাদের আগামী দিনের পথের সাথী। আমরা পরস্পর বন্ধুত্বে বিশ্বাসী আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ধারা প্রবর্তনে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের পার্শ্ববর্তী বড় দেশ ভারত গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে রাজনীতির জন্য রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে ইহার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্র মূল ধারার রাজনীতি পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতা কামনা করছি।

১৫তম ধারা

মানবাধিকার প্রশ্নে রাজনৈতিক অধিকারের উত্তরণ।

মানবাধিকার রাজনৈতিক নতুন সংবিধানে যুক্ত হলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। মর্যাদাবান দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। জনমানুষের ভাগ্য খুলে যাবে। দিন বদলের পালায় আমাদের স্বার্থ সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হবে। যাহার প্রতিটি ধারায় অন্তর্নিহিত আছে। রাজনৈতিক অধিকারে গণতন্ত্র, ১৮.৪৫ কোটি জন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সম অধিকার মূল পদক্ষেপ। বিশেষ সমমানের যৌথদলের প্রবর্তনে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে আসবে। যৌথদলীয় সংগঠনের মানুষিক আচরণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আমাদের প্রত্যাশা রাজনৈতিক ধারাগুলি বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার উত্থান ও পতন ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সম অধিকার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার নাম মানবাধিকার। একটি শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। শুধু মানুষ নয় সকল প্রাণীকেই প্রকৃতি পালন করে তাকে পৃথিবীতে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করে। এটাই সকল প্রাণীর অধিকার। মাবন সন্তান বিশ্বে প্রাণিকুলের সেরা জিব। বিশেষ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ছোট, বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই সর্বজন স্বীকৃত কিছু অধিকার রয়েছে। সে অধিকার হলো মানবাধিকার। যেমন-প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিশ্বে সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ আরো কিছু মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিচ্ছে।

ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের রয়েছে স্বাস্থ্যরক্ষা ও কল্যান নিশ্চিত করার উপযোগী জীবন মান অর্জন, শিক্ষা লাভ, কর্মসংস্থান, অবসর, জীবন যাপন, সামাজিক নিরাপত্তা লাভ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের অধিকার। আর রয়েছে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, চলাচলের স্বাধীনতা, নিজস্ব মত প্রকাশ ও জন সমর্থন, সমর্থন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে সমান মর্যাদার অধিকার ভোগ করা। মানব সভ্যতা এখন একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পন। কিন্তু আমরা দেখছি সমগ্র বিশ্বে নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্গিত হচ্ছে। নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত। দারিদ্র দেশগুলির মানুষ সমস্যার কাষাঘাতের কারণে মানবাধিকার বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে আশানুরোপ অগ্রগতি নেই।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারন করে পরস্পরের প্রতি মমতা, ভালিবাসা ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে যাবে এটাই একটি সভ্য সমাজে ন্যূনতম বাসনা। কিন্তু আমরা অপরিপোক্ত সমাজ ব্যবস্থা দেখতেই চাই না। চাই শুধু সুন্দর ও স্থিতিশীল সমাজে বাঁচতে চাই। বিশ্ববাসী মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে জাতিসংঘে যে সংঘ তৈরী হয়েছে তার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা অতি জরুরী। আর তার প্রয়োজন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে সাড়া বিশ্বের মানুষ আজ উপলদ্ধি করছে। অধিকার সম্পর্কে সমগ্র মানব সমাজ সচেতন না হওয়ার কারনে বৈষম্য প্রকট, যাহার আকাশ পাতাল।

কারণ মানুষ স্বভাবজাত নয় বরং বুদ্ধিভিত্তিক চেতনার দ্বারা পরিচালিত। তাই তার বুদ্ধি বেশি তার শক্তিও বেশি। শক্তির ভারসাম্য যদি শারীরিক হয় তাহা মোটেই মঙ্গলের নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হলে

মানব সমাজ তার অধিকারের ভারসাম্য হারাবে। আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

অতএব যৌথ দলীয় সংগঠন প্রথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম অধিকার ভারসাম্য রক্ষায় শক্তিধর ব্যবস্থা। বাস্তব কথা মানুষ যদি শক্তির দ্বারা বিভাজিত হয়, তবে শক্তিশালীর হাতে দুর্বলেরা অধিকার বঞ্চিত হয়-ফলে মানবাধিকার লঙ্গনের ধারনার উৎপত্তি সেখানে থেকেই। কিন্তু যৌথ দলীয় ও যৌথ সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচলনে মাববাধিকার আশার আলো ছাড়াবে। কারণ সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে যৌথ দলীয় ব্যবস্থায় কোন বিভাজন থাকবে না। মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে সভার সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ঐ ঘোষণার মাধ্যমে বলা হয় এমন একটি পৃথিবীর সূচনা হবে যেখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা ও বিশ্বাস নিশ্চিত হবে এবং ভয় ও অভাব থেকে মানুষ নিষ্কৃতি লাভ করবে। ঘোষণার ২৯ নং ধারায় ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশে স্বার্থে সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ রয়েছে। ১ ও ২ নম্বর ধারায় সম-মর্যাদার অধিকার ও রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিরক্ষায় জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি ১০ই ডিসেম্বর “মানবাধিকার দিবস” পালন করে।

বিশেষ করে নতুন ধারা উত্তরণের ফলে রাজনীতির কারণে অহেতুক আর কোন তাজা প্রাণ ঝরে যাবে না- দিতে হবে না জীবন বিসর্জন, হবে না কোন মায়ের বুক খালি, বিশেষ করে ভিন্ন মতের ধ্বংসাত্নক কার্যকলাপের অংশীদারিত্ব থাকবে না, ফলে গণমানুষের কোন আর্থিক ক্ষতি সাধন হবে না। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক কাতারে চলার মহান পথ রাজনীতি। রাজনীতি বৈষম্য দূর করার হাতিয়ার। বর্তমানে দেশে প্রচলিত রাজনীতির পরিবর্তে সামাজিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি অনেক, গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক। বিশেষ করে রাজনৈতিক বহুদলের কাতারে আমার উদ্যেগ ও প্রতির্ষ্ঠিত নূতন দলের নাম । আদর্শ গণতান্ত্রিক দল (Ideal Democratic Party)। এই দলকে যৌথদলের কাতারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে।

আর আমার লেখা **রাজনীতির নতুন ধারা উত্তরনে গণতন্ত্র** - নূতন ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা মূল গঠনতন্ত্র হিসাবে আত্নপ্রকাশের জন্য সৃষ্টিকর্তার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখি।

১৮.৪৫ কোটি জনমানুষের ভালোবাসা ও দোয়া কামনা আমার রাজনৈতিক নূতন দল আদর্শ গণতান্ত্রিক দল (Ideal Democratic Party) পক্ষে প্রত্যাশা। অগ্রযাত্রায় আপনার সহযোগীতা কামনা।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হবেন।